POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَحَآجَّهٗ قَوۡمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوۡٓنِّیۡ فِی اللّٰهِ وَقَدۡ هَدٰىنِ ؕ وَلَاۤ اَخَافُ مَا تُشۡرِكُوۡنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ یَّشَآءَ رَبِّیۡ شَیۡـًٔا ؕ

এবং তাহার জাতি তাহার সহিত বিতর্ক করিল। তখন সে বলিল, 'তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে তর্ক করিতেছ, অথচ তিনি আমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন? এবং তোমরা যাহাকে তাঁর সহিত শরীক করিতেছ উহাকে আমি আদৌ ভয় করি না, - আমার প্রভু যাহা চাহিবেন তাহা ব্যতিরেকে।

(আল আনআম: ৮২)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 32

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 11 আগস্ট, 2022 12 মহররম 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত দাউদ (আ.) নিজের উপার্জিত অর্থে জীবনযাপন করতেন।

১৮৮৫) হযরত মিকদাম (বিন মাআদী কারাব) (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, মানুষের নিজের হাতে উপার্জিত অর্থে আহার করার চাইতে উত্তম আহার নেই। আল্লাহ্ তা'লার নবী হযরত দাউদ (আ.) নিজের হাতে উপার্জিত অর্থেই সংসার নির্বাহ করতেন।

অসহায়দের প্রতি বিনম্র আচরণ করা।

২০৭০ হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন: তোমাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে থেকে এক ব্যক্তির আত্মাকে যখন ফিরিশতারা অভ্যর্থনা জানালো তখন সে তারা বলল, তুমি কি কোন পুণ্য কর্ম করেছ? সে উত্তর দিল, আমি যুবকদেররকে অসহায়দের সময় ছাড় দেওয়ার এবং তাদের ক্ষমা করার আদেশ দিতাম। (হযরত হুযাইফা (রা.) বলতেন, নবী (সা.) বলেছেন) ফিরিশতারা তাকে ক্ষমা করেছেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে বলল, আমি অসহায়দের প্রতি বিনম্র আচরণ করতাম আর অভাবীদেরকে ছাড় দিতাম।

২০৭১) নবী করীম (সা.) বলেছেন: এক বণিক ছিল যে মানুষকে ঋণে পণ্য দিত। যখন সে অভাবীদের দেখত তখন বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও, হয়তো আল্লাহ্ তা'লাও তাকে ক্ষমা করবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করেছেন।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

প্রতিটি কথা বলার পূর্বে ভেবে দেখ যে, তার পরিণাম কি হবে; এমন কথা বলার ক্ষেত্রে কতটুকু আল্লাহ্ তা'লার অনুমতি রয়েছে। যতক্ষণ এটা ভাবা না হয়, ততক্ষণ কথা বলো না। যে কথা অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে তা না বলাই শ্রেয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

জিহ্বাই মানুষকে তাকওয়া থেকে দূরে ঠেলে দেয়। জিহ্বার দ্বারাই মানুষ আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করে আর এর দ্বারাই তার মধ্যে ফেরাউন তুল্য বৈশিষ্টাবলী প্রবেশ করে। আর এই জিহ্বার কারণেই সে গোপন পুণ্যকর্মকে বাহ্যিকতায় পরিণতে করে। জিহ্বা খুব দ্রুত মানুষের ক্ষতি করে। হাদীসে বর্ণিত আছে, যে-ব্যক্তি নাভির নীচের অঙ্গ এবং জিহ্বাকে রক্ষা করে চলে আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ ততটা ক্ষতিকর নয় যতটা মিথ্যাবচন। কেউ যেন একথার এই অর্থ ভেবে না বসে যে নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষন ভাল কাজ। কেউ এমনটি মনে করলে সেটা তার মস্ত ভুল। আমার বলার উদ্দেশ্য হল, কোনও ব্যক্তি যদি একান্ত বাধ্য হয়ে শূকর ভক্ষণ করে তা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু সে যদি নিজের মুখে শূকর ভক্ষন বৈধ বলে নিদান দেয়, তবে এমন ব্যক্তি ইসলাম থেকে দূরে চলে যায়। কেননা, সে আল্লাহ্ নির্ধারিত নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ আখ্যায়িত করেছে। বস্তুত, এর থেকে বোঝা যায় যে জিহ্বা দ্বারা সংঘটিত ক্ষতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এই কারণেই মুত্তাকি তার জিহ্বাকে ভীষণ নিয়ন্ত্রনে রাখে। তার মুখ থেকে এমন কোনও কথা নিঃসৃত হয় না যা তাকওয়া পরিপন্থী। অতএব তোমরা নিজেদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রন কর, জিহ্বা যেন তোমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ না করে আর যাতে অনর্থক কথাবার্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখ।

প্রতিটি কথা বলার পূর্বে ভেবে দেখ যে, তার পরিণাম কি হবে; এমন কথা বলার ক্ষেত্রে কতটুকু আল্লাহ্ তা'লার অনুমতি রয়েছে। যতক্ষণ এটা ভাবা না হয়, ততক্ষণ কথা বলো না। যে কথা অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে তা না বলাই শ্রেয়। কিন্তু সত্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকাও মোমেনের মর্যাদা পরিপন্থী। সেই সময় কোনও ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনা এবং কোনও প্রকার ভীতি যেন জিহ্বাকে বিরত না রাখে। দেখ, আমাদের নবী করীম (সা.) যখন নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা করলেন, তখন আপন পর সকলে তাঁর শত্রুতে পরিণত হল। কিন্তু তিনি মুহূর্তের জন্যও সে সব কিছুর পরোয়া করেন নি। এমনকি, তাঁর চাচা আবু তালেব যখন মানুষের অভিযোগে অতিষ্ঠ হয়ে শেষমেশ তাঁকে বলে ফেললেন, সেই সময়ও তিনি সময়ও তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিলেন-'একথা প্রকাশ করা থেকে আমি নিবৃত্ত হতে পারি না। চাইলে আমার সঙ্গ দিন অথবা আমাকে নিঃসঙ্গ ত্যাগ করুন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮২)

আহলে কুরআন সম্প্রদায় এই বিষয়টি নিয়ে ভীষণ রকমের বিভ্রান্তির শিকার। তাদের দাবি, মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের মতই মানুষ ছিলেন, তাঁর কথা কেন মানব? সেই কথা মানব যা কুরআনে আছে। অমুক হাদীস সঠিক নয় বলে বিতর্ক করার অধিকার আমাদের রয়েছে, কিন্তু একথা বলতে পারি না যে, হাদীস ঠিক আছে, কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.) ভুল করেছেন। নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক।

জুমআর খুতবা, ৮ জুলাই ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল এর ৯০ নং আয়াত

وَيَوۡمَ نَبۡعَثُ فِىۡ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيۡدًا عَلَيۡهِمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِهِمۡ وَجِئۡنَا بِكَ شَهِيۡدًا عَلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ ؕ وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ تِبۡيَانًا لِّـكُلِّ شَىۡءٍ وَّهُدًى وَّرَحۡمَةً وَّبُشۡرٰى لِلۡمُسۡلِمِيۡنَ

এর ব্যাখ্যায় বলেন: এই আয়াতে পূর্ববতী আয়াতের বিষয়টিকে পূর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যখন সমস্ত নবী নিজের নিজের নমুনা উপস্থাপন করবেন, সেই সময় তুমিও তাদের সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপিত হবে আর আমি তোমাকে তাদের সামনে এনে প্রশ্ন করব যে, এও তোমাদের মধ্য থেকে একজন ছিল, সে কেন শিরক এবং অন্যান্য কুপ্রথার মধ্যে পড়ে নি এবং কেন আল্লাহ্ তা'লার অনুগত বান্দা হিসেবে অন্যদের হিদায়াতের কারণ হয়েছে? এর কারণ কি এটাই নয় যে তার উপর খোদা তা'লার বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল যা থেকে তোমরা বঞ্চিত ছিল। বরং তোমরা তো সেই বাণীর প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করতে না।

এরপর সেই ওহীর বরকতসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলেন- হে মহম্মদ! আমরা তোমার উপর সেই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে প্রত্যেক আধ্যাত্মিক চাহিদাবলীর ব্যাখ্যা রয়েছে এবং এর মধ্যে ঐশী কৃপা এবং হিদায়াতের উপকরণ রয়েছে। অর্থাৎ তোমার এবং তোমার জাতির মানুষের মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে তা এই বাণীর কারণেই।

এখানে 'কুল্লি শাইইন' বলতে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকে বোঝানো হয় নি। বরং সেই সব বস্তুকে বোঝানো

এরপর শেষের পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৯ সালের কাদিয়ান জলসার সমাপনী অধিবেশনে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর ভাষণ

(ভাষণের শেষাংশ...)

এই হলো মহানবী (সা.)-এর সেই মহান মর্যাদা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই উদ্ধৃতিতে তুলে ধুরেছেন। মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সত্তার কামেল এবং সর্বোৎকৃষ্ট বহিঃপ্রকাশ, এটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,"মহানবী (সা.) ঐশী সত্তার বা উলুহিয়্যতের সর্বোত্তম প্রকাশ অর্থাৎ পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ; এবং তাঁর বাণী বা কালাম খোদারই কালাম এবং তাঁর প্রকাশ খোদারই প্রকাশ এবং তাঁর আগমন খোদারই আগমন। তাই এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে-"এবং তুমি বল, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলীন হওয়ারই যোগ্য। (১৭:৮২) (ক্রমশ...) সত্য বা হক্ব বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুকে, কুরআন শরীফকে এবং মহানবী (সা.)-কে। আর মিথ্যা বা বাতিল বলতে বোঝানো হয়েছে শয়তানকে, শয়তানের দলকে এবং শয়তানী শিক্ষা-দীক্ষাকে। অতএব, দেখো! খোদা তা'লা কীভাবে নিজের নামে মহানবী (সা.)-কে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। মহানবী (সা.)-এর প্রকাশিত হওয়াই খোদা তা'লার প্রকাশিত হওয়া। আর তা এমন প্রতাপান্বিত বিকাশ, যার প্রভাবে শয়তান তার সকল সৈন্যসামন্ত নিয়ে পালিয়ে গেছে এবং তার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত সাব্যস্ত হয়েছে এবং তার দল দারুনভাবে পরাস্ত হয়েছে। এরূপ উৎকর্ষতার কারণে সূরা আলে ইমরানের তৃতীয় রুকুতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, সকল নবী-রসূলদের কাছে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে যে, তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য এবং অপরিহার্য হলো খাতামুররুসুলের মহিমা ও প্রতাপ বা জালালের কারণে তারা যেন তাঁর ওপর অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর ঈমান আনে এবং তাঁর সেই মহিমা ও সেই প্রতাপের প্রচারণার কাজে মনপ্রাণ দিয়ে সহায়তা করে। এ কারণেই হযরত আদম শফিউল্লাহ্ থেকে নিয়ে হযরত মসীহ্ কলেমাতুল্লাহ্ পর্যন্ত যত নবী ও রসূল অতীত হয়েছেন তাঁরা সবাই মহানবী (সা.)-এর মহিমা ও প্রতাপের স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়ে গেছেন।

এরপর তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে অর্থাৎ, যেভাবে আমাদের খোদা এক-অদ্বিতীয় উপাস্য অনুরূপভাবে আমাদের রসূলও এক ও অনুসৃত; একথা বলতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ গ্রন্থে লিখেন,অর্থাৎ এক-অদ্বিতীয় খোদার বান্দা আহমদ বলেন, খোদা তাকে নিরাপদ রাখুন ও সাহায্য করুন, খোদা ছাড়া আমাকে আর কেউ বুঝায় নি আর তিনি বুঝানোর ক্ষেত্রে সর্বোত্তম। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন আর আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমার প্রতি ওহী করেছেন যে, একমাত্র ইসলামই প্রকৃত ধর্ম আর সত্যিকার রসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.), ইমামদের নেতা। তিনি বিশ্বস্ত উম্মী রসূল। অতএব, যেভাবে ইবাদত খোদা তা'লারই জন্য স্বীকৃত আর তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, একইভাবে আমাদের রসূল অনুসরণের ক্ষেত্রে এক এবং তিনি খাতামুল আম্বিয়া হবার দিক থেকেও এক।

এরা আমাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে যে, দাবির পূর্বে একরকম বলেছেন আর দাবির পর ভিন্ন কথা বলেছেন, অথচ পুরো উদ্ধৃতিটি দাবির পরের অর্থাৎ ১৮৯৫ সনের। নিজ জীবনের মাধ্যমে মানবীয় শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হলেন একমাত্র মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)- এটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাকে বলা হয়েছে সব ধর্মের মাঝে ইসলাম ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম, আমাকে বলা হয়েছে সকল হেদায়েতের ভিতর শুধ কুরআনের হেদায়াতই শতভাগ নিখুঁত এবং মানবীয় মিশ্রণ থেকে পবিত্র। আমাকে বুঝানো হয়েছে যে, সব রসূলের মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষাদাতা, সবচেয়ে পবিত্র প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষাদাতা এবং নিজের জীবনের মাধ্যমে মানবীয় শ্রেষ্ঠত্বের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হলেন একমাত্র সৈয়্যদনা মওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তিনি বলেন, সেই সব পাদ্রী এখন কোথায় যারা বলে নাউযুবিল্লাহ্ আমাদের সম্মানিত নেতা ও সৃষ্টির সেরা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পক্ষ থেকে কোন ভবিষ্যদ্বাণী বা অলৌকিক কোন বিষয় প্রকাশ পায় নি? আমি সত্য সত্যই বলছি যে, ভূপৃষ্ঠে একমাত্র কামেল মানব তিনিই অতিবাহিত হয়েছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী এবং দোয়া গৃহীত হওয়া এবং অন্যান্য অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশিত হওয়া এমন একটি বিষয় যা আজ পর্যন্ত উম্মতের সত্যিকার অনুসারীদের মাধ্যমে প্রবাহমান বা তরঙ্গায়িত হয়ে চলছে। তিনি এই চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন এবং বলেন, ইসলাম ব্যতীত সেই ধর্ম কোথায় যা নিজের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য এবং এই সামর্থ্য রাখে এবং সেই সব লোক কোথায় ও কোন দেশে বসবাস করে যারা ইসলামী আশিস ও কল্যাণের মোকাবিলা করতে পারে, আজও যদি নিদর্শন দেখতে হয় কেবল ইসলামেই সেই নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় এবং তাদের মাঝে দেখা যাবে যারা সত্যিকার অর্থে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসারী।তিনি আরো বলেন, মানব জাতির জন্য ভূপৃষ্ঠে এখন কুরআন ছাড়া অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ নেই, আর সমস্ত আদম সন্তানের জন্য মহানবী (সা.) ছাড়া অন্য কোন শাফী বা যোজক নেই। তাই তোমরা ঐশ্বর্যপূর্ণ এই মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেম-বন্ধন রচনা করার চেষ্টা কর। কোনক্রমেই অন্য কাউকে তাঁর উপর কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে না যেন তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হতে পার। মনে রেখ! নাজাত বা মুক্তি এমন কোন বিষয় নয় যা কেবল মৃত্যুর পর প্রকাশ পায়। বরং প্রকৃত নাজাত সেটি, যা এ পৃথিবীতেই স্বীয় জ্যোতি বিকীর্ণ করে। সত্যিকার নাজাতপ্রাপ্ত কে? সে-ই যে বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'লা সত্য আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর এবং সৃষ্টির মধ্যবর্তী শাফী বা যোজক। আকাশের নীচে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মাঝে তিনিই শাফী এবং শাফায়াতকারী আর আকাশের নীচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নেই এবং পবিত্র কুরআনের সমমর্যাদার অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। আল্লাহ্ তা'লা অন্য কাউকে চিরস্থায়ী জীবন দানের ইচ্ছা করেন নি কিন্তু তাঁর মনোনীত এই নবী চিরকালের তরে জীবিত। মুসা (আ.) সেই ধনভাণ্ডার লাভ করেছিলেন, যা প্রথম যুগের লোকেরা হারিয়ে বসেছিল। আর মুহাম্মদ (সা.) সেই ধনভাণ্ডার লাভ করেছেন যা মূসার জামা'ত হারিয়ে ফেলেছিল। এখন মুহাম্মদী বিধান মুসায়ী বিধানের স্থলাভিষিক্ত কিন্তু মহিমা বা মর্যাদার নিরিখে সহস্র সহস্রগুণ শ্রেয়। তিনি বলেন, আমরা খোদাকে মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে পেয়েছি, সেই সর্বশক্তিমান, সত্য এবং কামেল খোদাকে আমাদের আত্মা ও আমাদের দেহের প্রতিটি অনু-পরমাণুসেজদা করে, যার হাতে প্রতিটি আত্মা ও সৃষ্টির প্রতিটি অনু-পরমাণুস্বীয় সকল শক্তিবৃত্তিসহ সৃষ্টি হয়েছে আর যে সত্তার কল্যাণে সকল অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, কোন জিনিসই তাঁর জ্ঞানের গণ্ডি এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয় এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মের উর্ধ্বে নয়। আর সহস্র সহস্র দরূদ, সালাম, রহমত এবং বরকত সেই পবিত্র নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ওপর বর্ষিত হোক, যার মাধ্যমে আমরা সেই জীবন্ত খোদাকে পেয়েছি, যিনি নিজ বাক্যালাপের মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণ দেন এবং অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করে তাঁর অনাদি ও অনন্ত শক্তি এবং পূর্ণ ক্ষমতার সমুজ্জ্বল চেহারা আমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন। অতএব, আমরা এমন রসূলকে পেয়েছি যিনি আমাদেরকে খোদা দেখিয়েছেন আর এমন খোদাকে আমরা পেয়েছি যিনি তাঁর পূর্ণ শক্তিবলে প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর শক্তি নিজের মাঝে কত অসাধারণ মাহাত্ম্য রাখে, যাকে বাদ দিয়ে কোন কিছু আকৃতি লাভ করে নি, যার অবলম্বন ছাড়া কোন কিছুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না, আমাদের সেই প্রকৃত স্রষ্টা অশেষ কল্যাণরাজির অধিকারী এবং অশেষ ক্ষমতাশীল ও অতীব সৌন্দর্যমণ্ডিত, অশেষ অনুগ্রহকারী। তিনি ব্যতিত অন্য কোন খোদা নেই। আমি যা কিছুপেয়েছি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কল্যাণে পেয়েছি; এ বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আমি সেই মহান সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যেভাবে তিনি ইবরাহীমের সাথে বাক্যালাপ ও বাক্যবিনিময় করেছেন আবার ইসহাক, ইসমাইল, ইয়াকুব ইউসুফ, মুসা এবং মসীহ্ ইবনে মরিয়ম আর সবার শেষে আমাদের নবী (সা.)-এর সাথে এমনভাবে কথোপকথন বা বাক্যালাপ করেছেন যে, তাঁর প্রতি সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং পবিত্র ওহী অবতীর্ণ করেছেন। একইভাবে তিনি আমাকেও তাঁর বাক্যালাপ ও কথোপকথনে সম্মানিত করেছেন কিন্তু এই সম্মান শুধু মহানবী (সা.)-

এরপর ১০পাতায়....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

জুমআর খুতবা

হযরত আবু বাকার অত্যন্ত দূরদর্শী এবং অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন এবং কোনও বিষয়ের পরিণামের উপর গভীর দৃষ্টি রাখতেন। যেখানে কঠোরতা অবলম্বন করার সেখানে কঠোরত অবলম্বন করতেন আর যেখানে ক্ষমার প্রয়োজন সেখানে ক্ষমাসুলভ আচরণ করতেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান সাহাবী এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সমুহের বিস্তারিত বর্ণনা।

হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে বিদ্রোহী মুরতাদদের বিরুদ্ধে ১১ তম অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৮ জুলাই , ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (৮ওয়াফা, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিলো সে সম্পর্কে কথা চলছিল। এ ধারাবাহিকতায় এগারোতম অভিযান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অভিযানটি ছিল মুহাজির বিন আবু উমাইয়্যার ইয়েমেন-এর বিদ্রোহী মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত (অভিযান)। হযরত আবু বকর (রা.) একটি পতাকা হযরত মুহাজির বিন উমাইয়্যাকে প্রদান করেছিলেন আর তাকে তিনি আসওয়াদ আনসির সেনাদলের মোকাবিলা করার এবং আবনা'দের সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাদের সাথে কায়েস বিন মাকশূহ্ এবং অন্যান্য ইয়েমেনবাসীরা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সে সময়ে ইয়েমেনে দু'টি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী ছিল, একটি হলো সেখানকার আদিবাসী, যাদের সম্পর্ক ছিল সাবাহ্ এবং হিমইয়ার এর বংশের সাথে। আর দ্বিতীয়টি হলো, পারস্যের আবা-এর বংশধর, যাদেরকে আবনা বলা হতো। আবনা-রা সে সময়ে ইয়েমেনের সবচেয়ে শক্তিশালী সংখ্যালঘু ছিল। দীর্ঘ সময় থেকে ইয়েমেন এর শাসক পারস্য সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। এ কারণে সরকারী অধিকাংশ পদ আবনাদের হাতে ছিল। যাহোক, লিখিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত মুহাজিরকে নির্দেশ দেন যে, এখানকার অভিযান শেষ করে কিন্দা গোত্রের মোকাবিলার জন্য 'হাযার মওত' চলে যাবে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭) (হযরত আবু বাকার কে সরকারি খুতুত, প্রণেতা- খুরশিদ আহমদ ফারুক, পৃ: ৫৯)

'হাযার মওত' ইয়েমেনের পূর্ব দিকে একটি বিস্তৃত অঞ্চল যেখানে বহু জনপদ রয়েছে। 'হাযার মওত' ও 'সান'র দূরত্ব হলো ২১৬ মাইল।

(মুজামুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১১) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২২৬)

কিন্দা ইয়েমেনের একটি গোত্রের নাম।

(ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২২৬)

হযরত মুহাজির (রা.)'র পরিচিতি সম্পর্কে লেখা আছে যে, তার নাম ছিল মুহাজির বিন আবু উমাইয়্যা বিন মুগীরা বিন আব্দুল্লাহ্। হযরত মুহাজির বিন আবু উমাইয়্যা, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.)'র ভাই ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি মুশরিকদের পক্ষ হতে অংশ গ্রহণ করেন এবং সেদিন তার দু'ভাই হিশাম এবং মাসউদ নিহত হয়। তার প্রকৃত নাম ছিল ওয়ালীদ, যেটিকে মহানবী (সা.) পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

(উসদুল গাবাহ,৫ম ভাগ, পৃ: ২৬৫) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ বাগ, পৃ: ১৮০)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাজির তাবুকের যু দ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। মহানবী (সা.) যখন উক্ত যুদ্ধ হতে ফিরে আসেন তখন তিনি (সা.) তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। একদিন হযরত উম্মে সালমা (রা.) মহানবী (সা.)-এর মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন, তখন তিনি (রা.) নিবেদন করেন যে, কোন কিছু আমাকে কীভাবে কল্যাণ পৌঁছাতে পারে যখনকিনা আপনি আমার ভাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট। হযরত উম্মে সালমা (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর মাঝে কিছুটা নম্রতা ও স্নেহের প্রকাশ দেখতে পান তখন তিনি (রা.) তার সেবিকাকে ইশারা করেন আর সে মুহাজিরকে ডেকে আনে। মু হাজির বারবার নিজের (মদীনায় অবস্থানের) কারণ ব্যাখ্যা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত মহানবী (সা.) তার অজুহাত মেনে নেন, তার প্রতি সন্তুষ্ট হন আর তাকে 'কিন্দা'র শাসক নিযুক্ত করেন। তবে অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে তিনি সেখানে যেতে পারেন নি। তখন তিনি যিয়াদকে লিখেন যে, তিনি যেন তার পক্ষ হতে তার দা যিত্ব ওপালন করেন। এরপর তিনি যখন সুস্থ হয়ে উঠেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাকে তার এমারতের দায়িত্বে বহাল রাখেন এবং তাকে নাজরান হতে ইয়েমেন-এর শেষ সীমানা পর্যন্ত অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন এবং যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০০)

যাহাক বিন ফিরোয বর্ণনা করেন যে, ইয়েমেনে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ মহানবী (সা.)-এর যুগেই দেখা দেয়, যার নেতা ছিল, যুল খিমার আবহালা বিন কা'ব, যে আসওয়াদ আনসী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৪)

আসওয়াদ আনসী, ইয়েমেন-এর বনু আনস গোত্রের সর্দার ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার কারণে তাকে আসওয়াদ বলা হতো।

(সীরাত সৈয়্যদানা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- আবুন নাসার, পৃ: ৫৭০)

এক রেওয়ায়েতে তার নাম আবহালা বিন কা'ব এর পরিবর্তে এ্যায়হালা বিন কা'ব বিন অওফ আনসী বর্ণিত হয়েছে। আসওয়াদ আনসীর উপাধি ছিল যুল খিমার, কেননা সে সব সময় কাপড় জড়িয়ে রাখতো।

(আল কামিলু ফিততারিখ লি ইবনে আসির, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০১)

আর কারও কারও মতে তার উপাধি ছিল, যুল খুমার অর্থাৎ, সর্বদা নেশায় মত্ত বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়।

(সীরাত সৈয়্যদানা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-আবন নাসার, পৃ: ৫৭০)

কতিপয় রেওয়ায়েতে তার উপাধি যুল হিমারও বলা হয়ে থাকে এবং এর একটি কারণ এটি বলা হয় যে, আসওয়াদের কাছে একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাধা ছিল; সে যখন সেটিকে বলতো, তোমার মনীবকে সিজদা কর, তখন সেটি সিজদা করতো, বসতে বললে বসতো, দাঁড়াতে বললে দাঁড়িয়ে যেতো। (আল আনসাব লি সাহারী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৭)

কারও কারও মতে তাকে যুল-হিমার বলার কারণ হলো, সে বলতো, আমার কাছে যেই সত্তা প্রকাশিত হন তিনি গাধায় চড়ে আসেন।

(মাদারাজুন নবুয়্যত, অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮১)

যাহোক, লিখিত আছে যে, আসওয়াদ 'রহমানুল ইয়েমেন' উপাধি অবলম্বন করেছিল যেভাবে মুসায়লামা নিজের জন্য'রহমানুল ইয়ামামা' উপাধি অবলম্বন করেছিল। সে এ-ও বলে যে, তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় এবং সে শত্রুদের সব পরিকল্পনা পূর্বেই জেনে যায়।

(সীরাত সৈয়্যদানা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-আবন নাসার, পৃ: ৫৭১)

আসওয়াদ ছিল একজন ভেলকিবাজ এবং সে মানুষজনকে আশ্চর্য সব ভেলকি দেখাতো।

(আল কামিলু ফিত তারিখ লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০১) বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নের মাধ্যমে পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, দু'জন নবুয়্যতের মিথ্যা দাবীকারকের আবির্ভাব হবে।

অতএব, হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَ فِيْ كَفِّيْ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرَا عَلَيَّ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا، صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ

অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেন, একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডার প্রদান করা হয় এবং আমার হাতে দু'টি স্বর্ণের বালা রাখা হয়। এটি আমার কাছে অসহনীয় লাগে। তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ওহী করেন, আমি যেন সেই দু'টোর ওপর ফুঁ দিই। আমি সেগুলোর ওপর ফুঁ দিলে সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি এর অর্থ করেছি দু'জন মিথ্যাবাদী যাদের মাঝখানে আমি রয়েছি; সানা'র আসওয়াদ আনসী ও ইয়ামামার মুসায়লামা কাযযাব।'

বুখারী শরীফেই আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন; আমাকে মহানবী (সা.)-এর স্বপ্নের কথা বলা হয়। তিনি (সা.) বলেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন আমাকে দেখানো হয় যে, আমার দুই হাতে দু'টি স্বর্ণের বালা রাখা হয়েছে যেগুলো দেখে আমি বিচলিত হই এবং সেগুলোকে অপছন্দ করি। আমাকে বলা হলে আমি সেই দু'টির ওপর ফুঁ দিই আর সেগুলো উড়ে যায়। (অর্থাৎ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হয়।)আমি এর ব্যাখ্যা করেছি দু'জন মিথ্যাবাদী, আমার বিরুদ্ধে আবির্ভূত হবে। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ্ বলেন, সেই দু'জনের একজন ছিল আনসী যাকে ইয়েমেনে ফিরোয হত্যা করেছে, আর অপরজন হলো মুসায়লামা কাযযাব।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪৩৭৯)

মহানবী (সা.) যখন পারস্য-সম্রাট কিসরাকেইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখেন তখন সে ভয়ানক ক্রুব্ধ হয়ে তার অধীনস্থ ইয়েমেনের গভর্নর বাযান, মতান্তরে যার নাম ছিল বাদহান, তাকে নির্দেশ দেন; সে যেন ঐ ব্যক্তিকে অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর মস্তক নিয়ে তার দরবারে আসে। বাযান দু'জনকে মহানবী (সা.)-এর কাছে পাঠায়, কিন্তু তিনি (সা.) তাদের বলেন, আমার আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন যে, তোমাদের সম্রাটকে তার পুত্র শেরোভিয়া হত্যা করেছে এবং তার স্থলে নিজে সম্রাট হয়েছে। একই সাথে তিনি (সা.) বাযানকে ইসলামগ্রহণের আহ্বান জানান এবং বলেন, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাকে যথারীতি ইয়েমেনের গভর্ন র রাখা হবে। একথা শুনে সেই দুই ব্যক্তি ফিরে গিয়ে বাযানকে সব বৃত্তান্ত জানায় এবং সেই সময়ের মাঝে বাযান এই সংবাদও পায় যে, সত্যিই এরূপ ঘটেছে; পারস্য সম্রাটকে তার পুত্র শেরোভিয়া খুন করেছে এবং তার স্থলে নিজে সম্রাট হয়েছে। বাযান মহানবী (সা.)-এর এই বাণী পূর্ণ হতে দেখে মহানবী (সা.)-এর ইসলামগ্রহণের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তিনি (সা.) তাকে ইয়েমেনের গভর্নর পদে বহাল রাখেন।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.), প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ১১৭-১১৮)

এই পত্র ও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর বিষয়ে এবং পারস্য সম্রাট যা বলেছিল সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও একস্থানে লিখেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা.) বলেন, আমি যখন পারস্য সম্রাটের দরবারে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থ না করি তখন আমাকে অনুমতি প্রদান করা হয়। আমি যখন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মহানবী (সা.)-এর পত্র পারস্য সম্রাটের হাতে দেই তখন সে পত্রটি দোভাষীকে পড়ে শোনাতে আদেশ দেয়। দোভাষী যখন উক্ত পত্রের অনুবাদ পড়ে শোনায় তখন পারস্য সম্রাট ক্রোধে পত্রটি ছিঁড়ে ফেলে। আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা.) যখন ফিরে এসে এই বৃত্তান্ত মহানবী (সা.)-কে অবগত করেন তখন মহানবী (সা.) বলেন,

আমাদের পত্রের সাথে পারস্য সম্রাট যে আচরণ করেছে, খোদা তা'লা তার রাজত্বের সাথে ও এমনই করবেন।

পারস্য সম্রাটের এহেন আচরণের কারণ হলো, আরবের ইহুদীরা, ঐ ইহুদীদের মাধ্যমে যারা রোম থেকে পালিয়ে ইরানী সম্রাজ্যে চলে গিয়েছিল আর রোমান সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে পারস্য সম্রাটের সঙ্গী দিয়েছিল, ফলে পারস্য সম্রাটের প্রিয়ভাজনে পরিণত হয়। তারা পারস্য সম্রাটকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অনেক উত্তেজিত করে রেখেছিল। তারা যেসব অভিযোগ করছিল, পারস্য সম্রাটের ধারণায় সেই পত্রটি তাদের কথার সত্যায়ন করেছে আর সে ভাবল যে, এই ব্যক্তি [তথা হযরত মুহাম্মদ (সা.)] আমার রাজত্বের প্রতি কুনজর রাখে। তাই সেই পত্র প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই পারস্য সম্রাট তার ইয়েমেনের গভর্ন রকে একটি পত্র প্রেরণ করে যার বিষয়বস্তু ছিল এমন যে, কুরাইশের এক ব্যক্তি নবুয়্যতের দাবি করেছে এবং এক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করছে। দ্রুত তার কাছে দু'জন ব্যক্তিকে প্রেরণ কর যারা তাকে [তথা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে] আমার কাছে ধরে নিয়ে আসবে। তখন পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে ইয়েমেনের গভর্নর বাযান এক অশ্বারোহীর সাথে এক সেনা কর্মকর্তাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করে এবং মহানবী (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে একটি পত্রও প্রেরণ করে (যার বিষয়বস্তু হলো) এই পত্র পাওয়ামাত্র এদের সাথে পারস্য সম্রাটের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হবেন। সেই অফিসার প্রথমে মক্কায় যায়। তায়েফের উপকণ্ঠে এসে সে জানতে পারে যে, তিনি (সা.) মদীনায় বসবাস করেন। অতএব, সে সেখান থেকে মদীনায় যায়। মদীনায় এসে সে মহানবী (সা.)-কে বলে যে, ইয়েমেনের গভর্নর বাযানকে পারস্য সম্রাট আদেশ দিয়েছে যে, আপনাকে গ্রেফতার করে যেন তার দরবারে উপস্থিত করা হয়। আপনি যদি এই আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানান তাহলে সে আপনাকেও হত্যা করবে আর আপনার জাতিকেও ধ্বংস করবে এবং আপনার দেশকে ধ্বংস করে ছাড়বে। তাই আপনি অনুগ্রহকরে আমাদের সাথে চলুন। মহানবী (সা.) তার কথা শুনে বলেন, আচ্ছা! তোমরা আগামীকাল আমার সাথে এসে সাক্ষাৎ করো। রাতে মহানবী (সা.) দোয়া করেন এবং মহা প্রতাপশালী আল্লাহ্ তাঁকে সংবাদ দেন যে, পারস্য সম্রাটের এই দুরাচরণের শাস্তি হিসেবে আমরা তার পুত্রকে তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছি।

এ বছরই জমাদিউল উলা'র দশ তারিখ সোমবার সে তাকে হত্যা করবে। অন্য কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি (সা.) বলেন, আজ রাতে তার পুত্র তাকে হত্যা করেছে। হতে পারে সেই রাতই ১০ই জমাদিউল উলা'র রাত ছিল। সকাল হলে মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে ডেকে আনান আর তাদেরকে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে অবগত করেন। এরপর মহানবী (সা.) বাযানের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করেন যে, খোদা তা'লা আমাকে জানিয়েছেন, পারস্য সম্রাট অমুক মাসের অমুক দিন নিহত হবে। এই পত্র যখন ইয়েমেনের গভর্ন রের হস্তগত হয় তখন সে বলে, ইনি সত্য নবী হলে এমনই ঘটবে অন্যথায় তাঁ র এবং তাঁ র দেশের খবর আছে। অল্প কিছুদিন পর ইরানের একটি জাহায ইয়েমেনের বন্দরে এসে ভিড়ে আর গভর্নরকে ইরানের বাদশাহ্ র একটি পত্র দেয় যার সিল মোহর দেখতেই ইয়েমেনের গভর্ন র বলে ওঠে- মদীনার নবী সত্য বলেছিলেন। ইরানের সম্রাট পরিবর্তন হয়েছে আর এই পত্রে ভিন্ন এক সম্রাটের সিল মোহর। সে যখন এই পত্র খোলে তখন সেখানে লেখা ছিল, ইয়েমেনের গভর্নর বাযানের প্রতি ইরানের শিরাওয়ায়েহ্ (Chosroes Shirawaih)-এর পক্ষ থেকে এই পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে যে,আমি সাবেক পারস্য সম্রাট তথা আমার পিতাকে হত্যা করেছি, কারণ সে নিজ দেশে রক্তপাতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, দেশের ভদ্রচেতা লোকদেরকে হত্যা করতো এবং প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালাতো। আমার এই পত্র পাওয়া মাত্রই তুমি সকল অফিসারের কাছ থেকে আমার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিবে। ইতোপূর্বে আমার পিতা আরবের এক নবীকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছিল সেটাকে রহিত জ্ঞান করো। এই পত্র পেয়ে বাযান এতই প্রভাবিত হয় যে, সে এবং তার সঙ্গী তখনই ইসলাম গ্রহণ করে এবং মহানবী (সা.)-কে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পাঠায়।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩১৭-৩১৯) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআনে এভাবে এর বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন।

বাযানের মৃত্যুর পর মহানবী (সা.) নিজের আমীরদের ইয়েমেনের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। মুআ'য বিন জাবাল ইয়েমেন ও হাযার মওতের এসব এলাকার মুয়াল্লিম (বা শিক্ষক) ছিলেন। সেজন্য তিনি এসব এলাকা পরিদর্শন করতেন। আসওয়াদ একজন গণক ছিল আর সে ইয়েমেনের দক্ষিণে বসবাস করতো। সে ভেলকিবাজি এবং ছন্দবদ্ধ বাক্য দ্বারা লোকদের মনোযোগ খুব দ্রুত নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতো। সে নবুওয়তের দাবী করে বসে। সে লোকদেরকে এমন ধারণা দিত যে, তার কাছে একজন ফিরিশ্তা আসে যে তাকে সব কিছু বলে দেয় এবং তার

শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও রহস্য উদ্‌ঘাটন করে। এতে সরল ও অজ্ঞ লোকদের বড় একটি সংখ্যা তার অনুগামী হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আসওয়াদ আনসী এই স্লোগানের প্রচলন করে যে, ইয়েমেন শুধু ইয়েমেন বাসীদের জন্য। ইয়েমেনের অধিবাসীরা জাতীয়তাবাদের এই স্লোগানেও খুব প্রভাবিত হয়। এই স্লোগান অনেক প্রাচীন, আজও এটিই ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে যে বিশৃঙ্খলা বিরাজমান সেটাও এ কারণেই। যেহেতু ইয়েমেনের অধিবাসীদের মাঝে তখনও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় নি সেজন্য তারা বিদেশী সরকারের আধিপত্য থেকে স্বাধীন হওয়ার জন্য আসওয়াদের জাতীয়তাবাদের স্লোগানে সাড়া দেয় এবং তার সাথে যোগ দেয়।

যখন এ বিপজ্জনক সংবাদ মদীনায় পৌঁছায় তখন মহানবী (সা.) মুতা যুদ্ধের শহীদদের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং উত্তর দিকের আক্রমণ প্রতিহত করতে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)'র সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিলেন তখন তিনি (সা.) ইয়েমেনের কর্মকর্তাদের বার্তা পাঠান তারা যেন নিজেদের মতো করে আসওয়াদের মোকাবিলা করা অব্যাহত রাখেন, হযরত উসামার সেনাবাহিনী বিজয়ী বেশে ফেরত আসামাত্রই তাদেরকে ইয়েমেনে প্রেরণ করা হবে।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০১)

আসওয়াদ আনসী বড় একটি সেনাদল প্রস্তুত করেছিল। তার সেনাদলে উটের আরোহী ছাড়াও সাতশ' অশ্বারোহী ছিল। পরবর্তীতে তার ক্ষমতা আরো দৃঢ় হতে থাকে। মুযহাজ গোত্রে তার স্থলাভিষিক্ত ছিল আমর বিন মা'দী কারেব। আমর বিন মাদী কারেব ইয়েমেনের বিখ্যাত অশ্বারোহী, কবি ও বক্তা ছিল। তার ডাকনাম আবু সওর ছিল। দশম হিজরীতে সে নিজ গোত্র বনু যাবীদ-এর প্রতিনিধি দলের সাথে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরে মুরতাদ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং কাদসিয়ার যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে। হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতের শেষদিকে তার মৃত্যু হয়।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৬,২০২) (তারিখে আদাবে আরাবী, অনুবাদ, পৃ: ৬৭-৬৮)

লিখা রয়েছে, আসওয়াদ আনসী প্রথমে নাজরানের অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ করে হযরত আমর বিন হাযাম ও হযরত খালেদ বিন সাঈদকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে। এরপর সে সানা'তে আক্রমণ করে সেখানে হযরত শাহার বিন বাযান তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কিন্তু তিনি শহীদ হয়ে যান। হযরত মুআ'য বিন জাবাল সে দিনগুলোতে সানা'তে ছিলেন কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি মুআরেবে হযরত আবু মুসার কাছে চলে যান। সেখান থেকে তারা উভয়ে হাযার মওত চলে যান। এভাবে আসওয়াদ আনসী ইয়েমেনের অধিকাংশ এলাকা করতলগত করে। আসওয়াদ আনসী হযরত শাহার বিন বাযানকে শহীদ করার পরে তার স্ত্রী, যার নাম ছিল মারযুবানা অথবা কোন কোন পুস্তক অনুসারে আযাদ ছিল তাকে জোর করে বিয়ে করে। এরইমাঝে ইয়েমেন এবং হাযার মওতের অধিবাসীদের নিকট মহানবী (সা.)-এর পত্র পেঁছায় যেটিতে তাদেরকে আসওয়াদ আনসীর সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ উদ্দেশ্যে হযরত মুআয বিন জাবাল দণ্ডায়মান হন আর এতে মুসলমানদের মনোবল দৃঢ় হয়। জিশনাস দেলমী বলেন, ওয়াবার বিন ইউহান্নেস নামক এক ব্যক্তি মহানবী (সা.) -এর পত্র নিয়ে আমাদের কাছে আসেন। জিশনাস দেলমীর নাম কোন কোন স্থানে জুশায়শ দেলমীও লেখা হয়েছে। যাহোক, ইনি সেসব লোকের একজন ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) ইয়েমেনে আসওয়াদ আনসী-কে হত্যা করার জন্য পত্র লিখেছিলেন আর তিনি ফিরোয এবং দাযোভিয়াহ্'র সাথে মিলে তাকে হত্যা করেছিলেন।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০১,২০২) (উসদুল গাবা ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৩৫) (মাদারিজুন নবুয়্যত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৪৩)

ওয়াবার বিন ইউহান্নেস-এর নাম ওয়াব্‌ রা বিন ইউহান্নেসও বর্ণিত হয়েছে, তিনি ইয়েমেনের আবনা (জাতির সদস্য) ছিলেন। তিনি দশম হিজরীতে মহানবী (সা.)-এর সমীপেউপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, এই পত্রে মহানবী (সা.) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমরা যেন নিজ ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং যুদ্ধ কিংবা কোন পরিকল্পনার মাধ্যমে আসওয়াদ আনসীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এছাড়া আমরা যেন তাঁর (সা.) বার্তা সেসব লোকের নিকট পৌঁছে দেই যারা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্মের সাহায্যার্থে প্রস্তুত। আমরা (সে অনুযায়ী) কাজ করি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে, আসওয়াদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করা দুঃসাধ্য।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৮) (তাবাকাতুল কুবরা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬২-৬৩) (উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০)

জিশনাস দেলমী বর্ণনা করেন, আমরা একটি বিষয় অবগত হই যে, আসওয়াদ এবং কায়েস বিন আবদে ইয়াগুসের মধ্যে কিছুটা কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মাঝে অনৈক্য অথবা অল্পবিস্তর মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমরা চিন্তা করলাম, কায়েস নিজের জীবনের বিষয়ে আশংকা বোধ করে।

কায়েস বিন আবদে ইয়াগুস-এর নাম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। একটি ভাষ্যমতে, তার নাম হুবায়রাহ্ বিন আবদে ইয়াগুস ছিল এবং এটিও বলা হয় যে, তার নাম আবদে ইয়াগুস বিন হুবায়রাহ্ ছিল। যাহোক, আবু মুসা'র ভাষ্য মতে তার নাম ছিল, কায়েস বিন আবদে ইয়াগুস বিন মাকশুহ্। এক বর্ণনামতে তিনি সাহাবী ছিলেন না কিন্তু অপর বর্ণনামতে, মহানবী (সা.)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ (হয়েছিল) এবং তাঁর (সা.)-এর বরাতে (কিছু) রেওয়ায়েত করার সম্মান লাভ করেছেন। তিনি আসওয়াদ আনসী'র হন্তারকদের একজন ছিলেন এবং আমর বিন মাদী কারেব-এর ভাগিনা ছিলেন। তিনি ইয়েমেনে মুরতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিন্তু পরে আবার ইসলামে ফিরে আসেন। ইরাক বিজয় এবং কাদসিয়া'র যুদ্ধে উল্লেখযোগ্যরূপে তার নাম পাওয়া যায়। তিনি নিহাওয়ান্দ-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সিফফীন-এর যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)'র সহযোদ্ধা হিসেবে শহীদ হন। জিশনাস দেলমী বলেন, আমরা কায়েস'কে ইসলামের দাওয়াত দেই এবং তার কাছে মহানবী (সা.)-এর বাণী পৌঁছালে তার এমন মনে হয়, আমরা যেন আকাশ থেকে অবতরণ করেছি। তাই ত্বরিৎ সে আমাদের কথা মেনে নেয় আর একইভাবে অন্যদের সাথেও আমরা পত্র বিনিময় করি। বিভিন্ন গোত্রপতিও আসওয়াদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। তারা পত্রের মাধ্যমে আমাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়, (যার) উত্তরে আমরা লিখেছিলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের উত্তর না দেই ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যেন নিজ স্থান থেকে অগ্রসর না হয় কেননা, মহানবী (সা.)-এর বার্তা পাওয়ার পর আসওয়াদ-এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। একইভাবে মহানবী (সা.) নাজরানের সকল অধিবাসীকেওআসওয়াদের বিষয় সম্পর্কে লিখেছিলেন। তারাও মহানবী (সা.)-এর কথা মেনে নেয়। এই সংবাদ যখন আসওয়াদ-এর কানে পৌঁছায় তখন সে নিজের ধ্বংস দেখতে পায়। জিশনাস দেলমী বলেন, আমার (মাথায়) একটি পরিকল্পনা আসে এবং আমি আসওয়াদের স্ত্রী আযাদ-এর কাছে যাই যে শাহর বিন বাযান-এর বিধবা স্ত্রী ছিল। আর শাহর বিন বাযান'কে হত্যা করার পর আসওয়াদ তাকে বিয়ে করেছিল। আমি তাকে আসওয়াদ-এর হাতে তার প্রথম স্বামী হযরত শাহর বিন বাযানের শাহাদত ও তার বংশের অন্যান্য সদস্যের মৃত্যু এবং তার পরিবার যেসব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও যুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েছিল তা স্মরণ করাই আর আসওয়াদ-এর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করি। তখন সে সানন্দে সম্মত হয় আরবলে, খোদার কসম! আমি আসওয়াদ-কে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করি। সে আল্লাহ্ প্র দত্ত কোন অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা করে না এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ কোন বস্তুকে পরিহার করে না। কাজেই, তোমরা যখনই চাইবে আমাকে জানিও আমি এ বিষয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। পরিশেষে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে আসওয়াদ-এর স্ত্রীর সাহায্যে এক রাতে তার প্রাসাদে ঢুকে আসওয়াদ আনসীকে হত্যা করা হয়। সকাল হলে দুর্গের দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে ব্যতিক্রমধর্মী আওয়াজ উত্তোলন করা হয় যে, ধর্মত্যাগী বিদ্রোহী আসওয়াদ তার অশুভ পরিণামে পৌঁছে গেছে; তখন মুসলমান ওকাফিররা দুর্গের চতুর্দিকে সমবেত হয়। এরপর তারা ফজরের আযান দেয় এবং বলে, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্ - অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্'র রসূল। আসওয়াদ আনসী মিথ্যাবাদী। এরপর তার মস্তক সেই লোকদের সামনে নিক্ষেপ করেন। এভাবে এই নৈরাজ্য তিন মাস পর্যন্ত এবং অপর এক বর্ণনানুযায়ী প্রায় চার মাস পর্যন্ত অশান্তি ছড়িয়ে প্রশমিত হয়ে যায় এবং সকল কর্মকর্তা ও আমীর প্রমুখগণ নিজ নিজ অঞ্চলে রীতি অনুসারে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন আর হযরত মুআ'য বিন জাবাল তাদের ইমামতি করতেন। আসওয়াদ আনসী'র হত্যা, তার সেনাদলের পরাজয় এবং তার নৈরাজ্য অবসানের সংবাদ মহানবী (সা.)-এর সমীপে প্রেরণ করার পূর্বেই তিনি (সা.) ইহধাম ত্যাগ করেছিলেন। এই রেওয়ায়েতেও রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) -এর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁকে আসওয়াদ আনসী'র হত্যার সংবাদ ওহীর মাধ্যমে সেই রাতেই প্রদান করেছিলেন যে রাতে সে নিহত হয়েছিল। অতএব, তিনি (সা.) পরের দিন সকালে এই সংবাদ সাহাবীদেরও প্রদান করেন এবং একথাও বলেন যে, তাকে ফিরোয হত্যা করেছে। হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতের আসনে সমাসীন হবার পর সর্বপ্রথম প্রাপ্ত সু -সংবাদ ছিল আসওয়াদ আনসী'র নিহত হওয়ার

খবর। আসওয়াদের নিহত হওয়ার সংবাদ যে রাতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে পৌঁছে (তার)পরের দিন সকালেই তিনি (সা.) ইহধাম ত্যাগ করেন। আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে যখন আসওয়াদের হত্যার সংবাদবাহী মদীনায় পৌঁছে তখন মহানবী (সা.)-কে সমাহিত করা হচ্ছিল। আরেকটি রেওয়ায়েত হলো, আসওয়াদকে হত্যার সংবাদ মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর ১০-১২ দিন পর মদীনায় পৌঁছে যখন হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে, কিন্তু এটি সেই দিনগুলোরই ঘটনা। ৮ -১০ দিন পূর্বে বা পরের (ঘটনা) হবে।

আসওয়াদকে হত্যার পর সানা'য় আগের মতো মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৪-৪০৫) (হযরত আবু বাকার কে সরকারি খুতুত, প্রণেতা-খুরশেদ আহমদ ফারুক) (আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০১-২০৪) (সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৩০১)

কিন্তু ইয়েমেনে পুনরায় বিদ্রোহ মাথাচাড়া দেয়।

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুসংবাদ যখন ইয়েমেনে পৌঁছে তখন শোধরানো অবস্থা পুনরায় বিগড়েযায়। কায়েস বিন আবদে ইয়াগুস, যে ফিরোয ও বাযোভেহ্'র সঙ্গে মিলিত হয়ে আসওয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং যে তাদের সহযোগিতায় আসওয়াদকে হত্যা করেছিল, পুনরায় ইসলাম ছেড়ে দেয়। সে যোগ্য ও দৃঢ়প্রত্যয়ী ব্যক্তি ছিল, জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল, ইয়েমেনে ইরানীদের ক্ষমতা তার কাছে সবসময় প্রশ্ন হয়ে বিরাজ করতো। তাদের শাসনাবসানের পর সে আবনা'র সমৃদ্ধি ও তাদের সামষ্টিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিকে ধূলিস্মাৎ করতে চাইতো। পূর্বেই সে একজন সফল সামরিক নেতা ছিল; সে আসওয়াদের সামরিক নেতাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে এবং আবনাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করে। ফিরোয ও বাযোভেহ্ উভয়ের সাথে সে সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলে। বাযোভেহ্ -কে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করে আর ফিরোয নিহত হতে হতে বেঁচে যায়। ফিরোয হযরত আবু বকর (রা.)-কে তার ও আবনাদের আনুগত্যের কথা জানিয়ে নিবেদন করেন যে, আমাদের সাহায্য করুন, আমরা ইসলামের খাতিরে সকল প্র কার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছি।

(হযরত আবু বাকার কে সরকারি খুতুত, প্রণেতা-খুরশেদ আহমদ ফারুক, পৃ: ৬০-৬১)

এটি লিখিত আছে যে, মহানবী (সা.) যখন ইহধাম ত্যাগ করেন তখন হাযার মওত অঞ্চলে তাঁর (সা.)-এর গভর্নর ছিলেন যিয়াদ বিন লাবীদ। হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ মহানবী (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন। হযরত যিয়াদ (রা.)'র এক ছেলে ছিলেন আব্দুল্লাহ্। আকাবার দ্বিতীয় বয়'আতের সময় তিনি সত্তরজন সঙ্গীসহ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামগ্রহণের পর মদীনায় ফেরত আসতেই তিনি তার গোত্র বনু বায়াযাহ্'র প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলেন, যেসব প্রতিমার তারা উপাসনা করতো। এরপর তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে মক্কায় চলে যান আর সেখানেই অবস্থান করেন, অবশেষে মহানবী (সা.) মদীনা অভিমুখে হিজরত করলে তিনিও হিজরত করেন। এজন্য হযরত যিয়াদ (রা.) -কে মুহাজিরআনসারী বলা হয়। হিজরতও করেছেন এবং আনসারও ছিলেন। হযরত যিয়াদ (রা.) বদর, উহুদ ও পরীখা সহ অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। মহানবী (সা.) হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার পর বনু বিয়াযা গোত্রের মহল্লা অতিক্রম করার সময় হযরত যিয়াদ (রা.) তাঁকে স্বাগত জানিয়ে নিজের বাড়িতে অবস্থানের জন্য আমন্ত্রন জানান। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার উটনীকে স্বাধীন ছেড়ে দাও, সে নিজেই গন্তব্য খুঁজে নিবে। নবম হিজরী সনের মহররম মাসে মহানবী (সা.) সদকা ও যাকাত সংগ্রহের জন্য পৃথক পৃথক মুহাসসেল বা সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। তখন তিনি (সা.) হযরত যিয়াদ (রা.)-কে হাযারা মওত অঞ্চলের মুহাচ্ছেল নিযুক্ত করেন। হযরত উমর (রা.)'র যুগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বেই বহালথাকেন। এই পদ থেকে অবসরগ্রহণের পর তিনি কু ফায় বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই তিনি ৪১ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০২) (পাচাশ সাহাবা, প্রণেতা-তালেব হাশমি, পৃ: ৫৫৭-৫৫৯)

এরপর হযরত মুহাজির (রা.)'র নাজরান অভিমুখে যাত্রা করা সম্পর্কে লিখা রয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) গঠিত এগারোটি সেনাদলের মধ্যে সবার শেষে হযরত মুহাজির বিন আবু উমাইয়্যার সেনাদল মদীনা হতে ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তাঁর সাথে মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের একটি দলও ছিল। এই সেনাদলটি পবিত্র মক্কা অতিক্রম করে যাওয়ার সময় আত্তাব বিন আসীদের ভাই মক্কার আমীর খালেদ বিন আসীদ (রা.)ও তাদের সাথে যুক্ত হন। এই বাহিনী যখন তায়েফ অতিক্রম করে তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন আস (রা.)ও তার সঙ্গীসাথিসহ এই বাহিনীতে যোগ দেন। অনুরূপভাবে পথিমধ্যে বিভিন্ন গোত্রের লোকও তার সাথে যুক্ত হতে থাকে।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৩০৫)

ফলে এটি অনেক বড় একটি বাহিনীরূপে সামনে অগ্রসর হতে থাকে।

আমর বিন মাদী কারেব এবং কায়েস বিন মাকশুহ গ্রেফতার হওয়া প্রসঙ্গে লিখা রয়েছে, যেমনটি পু র্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমর বিন মাদী কারেব তার সাহসিকতা ও শক্তির অহমিকায় ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল আর কায়েস বিন আব্দে ইয়াগুসকেও সঙ্গী বানিয়ে নিয়েছিল। এরা দুজন প্রত্যেক গোত্রে গিয়ে গিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে বিদ্রোহের ঘোষণা দেয়ার বিষয়ে প্ররোচিত করেছিল। এর ফলে নাজরানের খ্রিষ্টান অধিবাসীরা ছাড়া, যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল এবং হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালেও চুক্তিতে অনড় থাকে, অবশিষ্ট সকল গোত্র আমর বিন মাদী কারেবের সঙ্গ দেয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। খোদার মহিমা! ইয়েমেনের অধিবাসীরা যখন হযরত মুহাজের (রা.)-এর বড় একটি সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে আগমনের সংবাদ পেতে আরম্ভ করে তখন ইয়েমেনের অধিবাসীরা এই উৎকণ্ঠায় পড়ে যায় যে, তারা হযরত মুহাজের (রা.)-এর সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তারা তখ নও এমন অবস্থায়ই ছিল, এমতাবস্থায় তাদের নেতা কায়েস এবং আমর বিন মাদী কারেবের মাঝে বিভেদ দেখা দেয়। তাই হযরত মুহাজের (রা.)-এর মোকাবিলা করার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও তারা উভয়েই পরস্পরের ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট হয়ে যায়। অবশেষে আমর বিন মাদী কারেব মুসলমানদের সাথে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এবং এক রাতে সে তার লোকজন নিয়ে কায়েসের বসতিস্থলে আক্রমণ করে আর তাকে গ্রেফতার করে হযরত মুহাজের (রা.)-এর নিকট নিয়ে যায়। কিন্তু হযরত মুহাজের (রা.) কেবল কায়েসকে গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং তিনি আমর বিন মাদী কারেবকেও গ্রেফতার করেন এবং এদের দুজনের অবস্থা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে লিখে তাদের উভয়কে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন।

কায়েস এবং আমর বিন মাদী কারেবকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সামনে আনা হলে তিনি (রা.) কায়েসকে বলেন, তুমি কি আল্লাহ্'র বান্দাদের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতন করে তাদেরকে হত্যা করেছ? অপরদিকে তুমি মু'মিনদের বাদ দিয়ে মুশরেক ও মুরতাদ বিদ্রোহীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছ? তার পক্ষ থেকে কোন সুস্পষ্ট অপরাধ পাওয়া গেলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু কায়েস বাযভিয়ার হত্যার ষড়যন্ত্র এবং তাতে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়ে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানায়। এটি এমন একটি হত্যাকাণ্ড ছিল যা গোপনে ঘটানো হয়েছিল আর এ বিষয়ে কায়েসের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তাই হযরত আবু বকর (রা.) তাকে হত্যার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয় জনের পালা এলে হযরত আবু বকর (রা.) আমর বিন মাদী কারেবকে বলেন, তোমার কি লজ্জা হয় না যে, তোমরা অহরহ পরাজিত হচ্ছ আর তোমাদের গলার ফাঁস ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। তুমি যদি এই ধর্মের সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। এরপর তিনি (রা.) তাকেও মুক্ত করে দেন আর এই উভয় ব্যক্তিকে, অর্থাৎ আমর ও কায়েসকে তাদের গোত্রের কাছে হস্তান্তর করেন। আমর বলে, অবশ্যই এখন আমি আমীরুল মু'মেনীনের উপদেশ অনুসারে কাজ করব এবং কখনোই আর এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করব না।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৯) (সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ২৫৩-২৫৪)

সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ না থাকায় আর তারা সরদার হওয়ায় ও তাদের জ্ঞানের কারণে তাদের দুজনকে তিনি ক্ষমা করে দেন।তাদের ক্ষমার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আরেকজন ঐতিহাসিক হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে লিখেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) অনেক দূরদর্শী ও অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন আর পরিণতির ওপর দৃষ্টি রাখতেন।

যেখানে কঠোরতার প্রয়োজন হতো সেখানে কঠোরতা অবলম্বন করতেন আর যেখানে ক্ষমা ও মার্জনা করার প্রয়োজন হতো সেখানে ক্ষমা ও মার্জনা করতেন। বিভিন্ন গোত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকদের তিনি

ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা ও গভীর আগ্রহ রাখতেন। তাঁর এমন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল যে , বিরোধী গোত্রগুলোর নেতাদেরকে সত্য তথা ইসলামে ফিরে আসার পর ক্ষমা করে দেওয়া উচিত বলে মনে করতেন। ইয়েমেনের মুরতাদ গোত্রগুলোকে অনুগত করার পর তিনি (রা.) যখন তাদেরকে ইসলামী সাম্রাজ্যের মাহাত্ম্য ও বিজয় এবং মুসলমানদের সম্মান ও শক্তি আর তাদের সংকল্পের দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন তখন গোত্রগুলো তা মেনে নেয় এবং ইসলামী সরকারের অনুগত হয়ে যায় আর রসু লুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। হযরত আবু বকর (রা.) এসব গোত্রীয় নেতাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সাথে কঠোরতার পরিবর্তে নম্রতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা সমীচীন মনে করেন। অতএব তিনি তাদের শাস্তি প্রত্যাহার করে নেন, তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলেন এবং গোত্রগুলোর মাঝে তাদের যে প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে সেগুলোকে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করেন। তিনি তাদের দুর্বলতা ক্ষমা করে দেন, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেন। কায়েস বিন আবদে ইয়াগুস এবং আমর বিন মাদী কারেবের সাথেও একই ব্যবহার করেন। তারা উভয়েই আরবের সাহসী বীর ও বুদ্ধিমান লোকদের অন্তর্ভু ক্ত ছিল। তাই তাদের বিনষ্ট করা আবু বকর (রা.)-এর কাছে সমীচীন মনে হয় নি। তিনি তাদেরকে ইসলামের জন্য বেছে নেওয়া এবং ইসলাম ও ধর্মত্যাগের মধ্যবর্তী দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে তাদের বের করার ইচ্ছা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) আমর বিন মাদী কারেবকে মুক্ত করে দেন। সেদিনের পর আমর আর কখনোই মুরতাদ হয় নি, বরং ইসলাম গ্রহণ করে এবং উত্তম মুসলমান হয়ে জীবনযাপন করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য করেন আর ইসলামের বিভিন্ন বিজয়ের ক্ষেত্রে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কায়েসও তার কৃতকর্মের কারণে লজ্জিত হয়, ফলে আবু বকর (রা.) তাকেও ক্ষমা করে দেন। আরবের এই দু ই যোদ্ধাকে ক্ষমা করার ফলে খুবই সুদূর প্রসারী ফলাফল সামনে আসে। হযরত আবু বকর (রা.) এমনভাবে তাদের মন জয় করেন যে,মুরতাদ হওয়ার পর ভয়ভীতি বা লোভে পড়ে (হোক), তারা ইসলামে ফিরে এসেছে। তিনি আশআস বিন কায়েসকেও ক্ষমা করে দেন। এভাবে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের হৃদয়গুলোকে তাঁর ভালোবাসাপাশে আবদ্ধ করেন এবং সেগুলোর মালিক বনে যান আর ভবিষ্যতে এরা-ই ইসলামের সাহায্য-সমর্থন এবং মুসলমানদের শক্তির মাধ্যমে পরিণত হয়।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৩১৩-৩১৪)

অর্থাৎ কোন জবরদস্তি ছিল না, বরং মন থেকে তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর আনুগত্য করে।

হযরত মুহাজের নাজরান থেকে লাহ্জিয়া অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন আর তাঁর অশ্বারোহীরা তাদেরকে ঘিরে ফেললে তারা নিরাপত্তা প্রার্থনা করে, কিন্তু মুহাজের তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। হযরত মুহাজের (রা.)-এর সাথে তাদের একদলের আজীব নামক স্থানে মোকাবিলা হয়। আজীব ইয়েমেনের একটি স্থানের নাম। হযরত মুহাজের (রা.)-এর অন্য অশ্বারোহীরা হযরত আব্দুল্লাহ্ র নেতৃত্বে আখাবেসের পথে তাদের মোকাবিলা করে এবং যে সকল শত্রু পলায়ন করেছিল তাদেরকে প্রতিটি রাস্তায় ধরে ধরে হত্যা করে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৯) (মুজামুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৯)

ইয়েমেনের আলাব অঞ্চলে বনু আক যখন বিদ্রোহ করে তখন তাদের নাম দেওয়া হয় আখাবেস আর যে পথে এসব দুষ্ট প্রকৃতি ও মন্দ স্বভাবের লোকদের সাথে যুদ্ধ হয় সেটিকে পরবর্তীতে তরিকুল আখাবেস নাম দেওয়া হয়। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৪-২৯৫)

হযরত মুহাজের (রা.)-এর সানআ-য় পৌঁছার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মুহাজের আজীব থেকে যাত্রা করে সানআ-য় পৌঁছার পর পলায়নকারী বিভিন্ন গোত্রের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেন। মুসলমানরা তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে ধরতে পারে তাদেরকেহত্যা করে আর কোন বিদ্রোহীকেই ক্ষমা করে নি, তবে অবাধ্যরা ছাড়া যারা তওবা করেছিল তাদের তওবা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ, যারা যুদ্ধ করেছিল, অত্যাচার করেছিল তাদেরকে ক্ষমা করেন নি, কিন্তু বাকিদের ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তাদের পূর্বের অবস্থা অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করা হয় আর তাদের পক্ষ থেকে সংশোধনের আশা ছিল।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৯)

এ বিবরণ এতটুকুই। পরবর্তী বিবরণ একটু দীর্ঘ হওয়ায় (আজ) এখানেই শেষ করছি, বাকিটা ভবিষ্যতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাল্লাহ্।

****

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: এক আরব মহিলা হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে পত্রে লেখেন- কোনও এক ভদ্রমহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করেছে যে মেয়েদের ভ্রূ উপড়ে ফেলা ও শরীরে উল্কি তৈরী করা কি বৈধ? হুযুর আনোয়ার (আই.) ২৭ শে এপ্রিল ২০২১ তারিখের চিঠিতে লেখেন- উল্কি তৈরী করা বৈধ নয়। হাদীসেও এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সৌন্দর্য লাভের জন্য যারা শরীরে উল্কি আঁকে বা অন্যের শরীরে উল্কি তৈরী করে দেয়, যারা মুখের রোম উপড়ে ফেলে, সামনের দাঁতে ফাঁক তৈরী করে এবং চুলে তালি দেয়, আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর অভিসম্পাত করেন। কেননা তারা আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস)

ইসলামের প্রতিটি বিধিনিষেধের মধ্যে কোনও না কোনও প্রজ্ঞা নিহিত আছে। অনুরূপভাবে কিছু কিছু ইসলামী বিধিনিষেধের বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপট থেকে সরে সেই সব বিধি নিষেধের দিকে দৃষ্টি দিলে সেই বিধিনিষেধের রূপটাই পাল্টে যায়। আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় পৃথিবীতে, বিশেষ করে আরব মহাদ্বীপে, একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রকারের শিরকের বিষবৃক্ষ প্রসার লাভ করেছিল, তেমনি অপরদিকে বিভিন্ন প্রকারের কুপ্রথা ও পথভ্রষ্টতা মানবতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে বিভিন্ন শিরকপূর্ণ প্রথা ও সামাজিক কদাচারে নিমজ্জিত ছিল।

উপরোক্ত বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসে দুটি বিষয়ের বিশেষভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমত এর মাধ্যমে খোদা তা'লার সৃষ্টির মধ্যে বিকৃতি তৈরী করার উদ্দেশ্য থাকে এবং দ্বিতীয়ত সৌন্দর্য লাভ দৃষ্টিপটে থাকে।

এই দুটি বিষয় নিয়ে অনুধাবন করলে জানা যায় যে প্রথমত খোদা তা'লার সৃষ্টিতে পরিবর্তন বা বিকৃতি একদিকে যেমন সামাজিক কদাচারের প্রতি ইঙ্গিত করছে। তেমনি এর মধ্যে রয়েছে শিরকপূর্ণ কার্যকলাপেরও প্রতিফলন। সুতরাং, লম্বা পরচুলো লাগিয়ে মাথায় চুলের পাগড়ি বানিয়ে সেটিকে সম্মানের প্রতীক মনে করা, কোনও পীর ও গুরুর মানত হিসেবে চুলের জটা তৈরী করা, চুলকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে মাঝে ক্ষুর দিয়ে চেঁছে ফেলা এবং সেটিকে বরকতের কারণ বলে মনে করা, অনুরূপভাবে বরকত অর্জনের জন্য শরীর, চেহারা এবং বাহুতে কোনও দেব-দেবী, মূর্তি বা পশুর ছবি উল্কি দিয়ে আঁকা- এগুলি সবই শিরকপূর্ণ কার্যকলাপ ছিল আর এর নেপথ্যে ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার।

দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ সৌন্দর্য অর্জনের জন্য এমন করা, অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক কদাচার এবং অশ্লীলতাকে প্রকাশ করে। বৈধ সীমার মধ্যে থেকে মানুষ যদি নিজের সৌন্দর্যের জন্য কোনও বৈধ পন্থা অবলম্বন করে তবে কোনওভাবেই নিষিদ্ধ নয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট নিবেদন করে যে এমনটি করা (সৌন্দর্য বৃদ্ধি) আমার ভাল লাগে আর আমি চাই আমার পরনের কাপড়, জুতো ভাল হোক। এগুলি কি অহংকারের মধ্যে পড়ে? হুযুর (সা.) বললেন, এগুলি অহংকার নয়। অহংকার হল সত্যকে অস্বীকার করা এবং অপরকে তুচ্ছ মনে করা। সেই সঙ্গে হুযুর (সা.) এও বলেন যে, 'ইন্নাল্লাহ্ জামীলুন ইউহেব্বুল জামাল' । অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা অতীব সৌন্দর্যের অধিকারী আর তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। (সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

অতএব, যে সৌন্দর্য লাভের জন্য অভিসম্পাতের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, নিশ্চয় তার অর্থ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। তাই আমরা যখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই হাদীসগুলির বিষয় নিয়ে প্রণিধান করি, তখন দেখতে পাই যে এই বিষয়গুলি নিষেধ করার পাশাপাশি হুযুর (সা.) এও বলেছেন যে বনী ইসরাইল জাতি সেই সময় ধ্বংস হয়েছিল যখন তাদের মহিলারা এই ধরণের কাজ করতে শুরু করে। হুযুর (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় ইহুদীদের মধ্যে অশ্লীলতা সাধারণ বিষয় ছিল আর মদিনায় একাধিক পতিতালয় ছিল যেখানে থাকা মহিলারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করত। এই কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর এই কাজগুলির কদর্যতা

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, Murshidabad.**

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাত

গত ১১ ডিসেম্বর ২০২১, ৫০ জন আরব আহমদী মুসলমান পুরুষের সাথে, যাদের মধ্যে অনেকেই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়আত গ্রহণকারী, এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে MTA স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর অংশগ্রহণকারীগণ টরেন্টোর পীস ভিলেজের আইওয়ানে তাহের হল থেকে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হওয়া একটি সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিক পর্বের পর অংশগ্রহণকারীগণ হুযূর আকদাসকে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াবলী সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

দোয়ার ধারণা এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে কার্যকরী উপায়ে দোয়া করতে পারেন– এ সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

প্রশ্নকারী আরও উল্লেখ করেন যে, যখনই তিনি হুযূর আকদাসকে দোয়ার জন্য লেখেন তখনই তার দোয়া দ্রুত কবুল হয়।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, যখনই আপনারা আপনাদের সমস্যাবলী সম্পর্কে আমার কাছে পত্র লেখেন তখনই তিনি আপনাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে সেসব সমস্যাবলী সমাধান করে দেন। সুতরাং এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ।"তার প্রশ্নের উত্তরে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:"আপনার বিশ্বাস দৃঢ়তর করার চেষ্টা করা উচিত এবং আপনার ইবাদতে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আরও বেশি নিবেদিত হওয়া উচিত। তিনি আমাদেরকে ইবাদত করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন, যা হচ্ছে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করা। আর তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যে, যদি আমরা আরও অধিকহারে ইবাদত করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাদের নফল নামায আদায় করা উচিত এবং ঐ নামাযে অশ্রুপাত করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নিকট অনুনয়-বিনয় করা উচিত। প্রবল আকুলতার সঙ্গে ইবাদত করুন, তখন আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুল করবেন।" হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:"আপনার নিজেকে মূল্যায়ন করা উচিত যেন আপনার অবস্থা এমন হয় যে, আপনার দৃঢ় ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস আছে আল্লাহ্ তা'লা আপনার দোয়া শুনেন ও কবুল করেন এবং আপনার ধর্ম-বিশ্বাসই চূড়ান্ত ধর্ম। এমনকি আল্লাহ্ তা'লা যদি আপনার সকল দোয়া কবুল না-ও করেন, তবুও বিশ্বাস করতে হবে যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় এবং এই ঈমানে আপনাদের দৃঢ়তার মাঝে কখনও যেন দুর্বলতা সৃষ্টি না হয়।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন: "আল্লাহ্ তা'লা সকল দোয়া কবুল করতে বাধ্য নন। এটি আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা, কোন্ দোয়া কবুল করা উচিত তিনিই ভাল জানেন। একজন প্রকৃত মু'মিনের, এমনকি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়াও কখনও কবুল হয়েছে, কখনও কবুল হয় নি। এটি এই কারণে যে, (একজন মু'মিনের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার) এই সম্পর্ক বন্ধুত্বের মত, মাঝে মাঝে আপনি আপনার বন্ধুর কথা মত কাজ করেন আবার অন্যান্য সময় করেন না। এটি হচ্ছে দোয়ার তাৎপর্য যা আমাদেরকে মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন।"

হুযূর আকদাস বলেন, একজন ব্যক্তির বিশ্বাস এক ঝাঁক পাখির মত হওয়া উচিত নয় যারা একটি জমিতে তখন নামে যখন তাদের খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসল থাকে। কিন্তু যখন তাদের খাবার ফুরিয়ে যায় তখন তারা উড়ে অন্যত্র চলে যায়। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যখন আমাদের দরকার পড়বে, তখন আমরা আসবো, একত্রিত হবো এবং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে ঝুঁকব, নিজেদেরকে তাঁর দরবারে উপস্থাপন করব। আবার যখন আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, আমরা আল্লাহকে ভুলে যাবো এবং জাগতিকতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়বো এমন হওয়া উচিত নয়। সুতরাং সঠিকভাবে দোয়া করার জন্য একজন ব্যক্তির উচিত দোয়ায় অবশ্যই অটল হওয়া এবং ব্যাকুলতা অবলম্বন করা এবং আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস নিখুঁত করতে হবে।" অন্য একজন প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করেন যে, পশ্চিমা বিশ্বের স্কুল ও সমাজের যেসব ধারণা ও বিশ্বাসসমূহ ইসলামের নৈতিক শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেসব থেকে কীভাবে শিশুদের রক্ষা করা যায়?

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:"আপনার সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলুন। সন্তান যেন জানে তার মা তার বন্ধু এবং তাকে অবশ্যই সবকিছু জানাতে হবে। শিশুকে জানাতে হবে তার বাবা কর্কশ এবং অসংবেদনশীল নন। তাকে জানাতে হবে তার বাবা তার ওপর চিৎকার করবেন না কিংবা মারবেন না বরং তিনি একজন বন্ধু। তখন একজন সন্তান তার বাবাকে সবকিছু জানাবে। বিশেষত সন্তানরা যখন তেরো বা চৌদ্দ বছরে পৌঁছায়, তারা তাদের বাবার কাছ থেকে সতর্ক থাকে এবং দূরত্ব বজায় রেখে চলে। এমন এক বয়সে পিতার উচিত তার সন্তানদের তার নিকটবর্তী করা এবং বন্ধুত্ব গড়ে তোলা। তারা স্কুলে কী শিখেছে তা যদি আপনাকে জানায় তখন আপনি তাদেরকে দিকনির্দেশনা দিতে পারবেন এবং তারা যা শিখেছে এর সুফল ও কুফল নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"তারা স্কুলে যা-ই শিখুক আপনাকে তার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে এবং তারা যখন প্রশ্ন করবে তখন তাদেরকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু যদি আপনারা রাগান্বিত হয়ে যান তখন তারা মনে করবে তাদের মাতা-পিতার কাছে তাদের প্রশ্নসমূহের কোন উত্তর নেই, তাই তারা বাইরে যা শিখছে তা সঠিক। তারা ভাববে, তাদের মাতা-পিতা মূর্খ ও অশিক্ষিত। তাই আপনাকে সময়ের নতুন প্রবণতা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। এখন সময় বদলে গেছে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে।"একজন অংশগ্রহণকারী আরব-বিশ্ব বর্তমানে কেন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে সে বিষয়ে হুযূর আকদাসের অভিমত জানতে চান।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আরব বিশ্বের প্রারম্ভিক অধঃপতনের কারণ কী ছিল? এখনও সেটিই কারণ। অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'লাকে পরিত্যাগ করা হয় এবং তখন জাগতিক ক্ষমতাশালী শক্তিসমূহকে খোদা মনে করা হয়। সৌদি আরবের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রের যখন এই অবস্থা হয় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র মুসলমান রাষ্ট্রও একই পথে চলে, তখন অবশ্যই তাদের ওপর থেকে আল্লাহ্‌র হেফাযতের হাত উঠে যায়। এছাড়া সেখানে খোদার নির্দেশ মেনে চলার প্রতি অবহেলা দেখা যায়, আর খোদা তা'লা তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন সেগুলোর তারা চরম অপব্যবহার করে থাকে।" হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন যে, বিশাল সম্পদ থাকার পরও ইসলামী দেশসমূহ তাদের সম্পদকে ইসলামের সেবায় ব্যয় করে না।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "আল্লাহ্ তা'লা [আরব বিশ্বকে] যে সম্পদ দিয়েছেন, তারা তা কী কাজে লাগিয়েছে? এর মাধ্যমে ধর্মের কী সেবা তারা করেছে? আহমদীয়া মুসলিম জা'মাত আর্থিক কুরবানির মাধ্যমে প্রাপ্ত সামান্য সম্পদ নিয়ে পবিত্র কুরআনের বাণী সারা বিশ্বে পৌঁছে দেয়ার কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে, ক্ষুদ্র (মুসলিম) দেশগুলোর ষান্মাসিক বা মাসিক ব্যয় আহমদীয়া মুসলিম জা'মাতের বার্ষিক বাজেটের চেয়েও বেশি কিন্তু ইসলামের তারা কী সেবা করছে? তারা মনে করে যে, আহমদীয়া মুসলিম জা'মাতের ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা করা এবং কুফরী ফতোয়া দেওয়াটাই [তাদের জন্য যথেষ্ট]।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"যখন আমরা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'লায় বিশ্বাস করি এবং তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলি, তখন এই একই রাষ্ট্রসমূহ উন্নতি করা শুরু করে। বিশ্বে মুসলমানরা স্বল্প শক্তির অধিকারী নয়। তারা ৫৪টি দেশ এবং তারা অনেক কিছুই করতে পারে। কিন্তু গোষ্ঠীতন্ত্রও জাগতিকতায় নিমজ্জিত হয়ে তারা বিভক্ত হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর হাদীসে এ বর্ণনা ছিল যে, যখন মুসলমানদের মধ্যে কপটতা চলে আসবে তখন তাদের উন্নতি থেমে যাবে, সে সময় বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং একজন ব্যক্তি আসবেন যিনি মানুষদের একত্র করবেন, আর তাই, যখন সেই ব্যক্তি আবির্ভূত হবেন, তখন তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার নির্দেশ তিনি প্রদান করেছেন।

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola (Murshidabad)

২০২১ সালে মে মাসে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর সাক্ষাত অনুষ্ঠান।

২১ শে আগস্ট ২০২১ সালে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর বাৎসরিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে হযরত আমিরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সঙ্গে খুদ্দাম সদস্যরা সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন।

হুযুর আনোয়ার সাক্ষাতের জন্য নিজ অফিস ইসলামাবাদ (টিলফোর্ডে) থেকে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন অপর দিকে ১৫০০ এর অধিক খুদ্দাম সদস্য এফ.এস.ভি স্টেডিয়াম থেকে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় যথারীতি কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর খুদ্দাম সদস্যরা হুযুর আনোয়ারকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করার সৌভাগ্য লাভ করে।

এক খাদিম প্রশ্ন করে যে, খলীফা হিসেবে আপনার ব্যস্ততা কি আপনাকে কঠিন বলে মনে হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: স্বাভাবিকভাবেই কাজ যদি সঠিকভাবে করা হয়, তবে তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তা সহজ করে দেন, তাই কাজ হয়ে যায়। প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন করে নেওয়াই আমার অধিকাংশ দিনের রুটিন। তবুও চিন্তা থাকে যে, যতটুকু কাজ করার উচিত ছিল তা যেন হয়ে যায়। আর যদি তা না হয় তবে আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্ট হন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ কঠিন হয়ে পড়ে। আর প্রতিটি কাজ যদি গুরুত্বসহকারে করা হয় তবে তা অবশ্যই কঠিন, তার জন্য পরিশ্রম করতে হয়।

এক খাদিম প্রশ্ন করে যে, কোরোনা মহামারির কারণে অনেক জামাতী অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। দুই বছর পর পুনরায় যুক্তরাজ্যের জলসা হল। এই বিষয়ে আপানার আবেগ অনুভূতি কেমন ছিল?

হুযুর আনোয়ার বলেন: খুব ভাল লেগেছে। ছোট আকারে হলেও আল্লাহ্ তা'লা জলসার আয়োজন সম্পন্ন করার তৌফিক দান করেছেন। আল হামদোল্লিাহ। কিন্তু অনলাইনে এই জলসা সারা বিশ্বের জামাতগুলি বিভিন্ন জায়গায় সমবেত হয়ে শুনেওছে এবং অনেকে অন্যের বাড়িতে গিয়েও শুনেছে। রিপোর্ট অনুসারে লক্ষ লক্ষ মানুষ জলসা শুনেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তা'লা কোভিডের পর অনেক বড় সফলতা দান করেছেন। এবং ভবিষ্যতের নতুন পথ উন্মোচিত হল। এই যে আশঙ্কা ছিল যে জানি না জলসা কবে হবে কিম্বা হবে না আর জামাতের সদস্যদেরকে এই প্রকার হতাশা গ্রাস করছিল তা দুর হয়েছে। এই জন্য আমি আনন্দিত হব, এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। আর আমার মতে তোমরাও নিশ্চয়ই খুশি হয়েছ।

এক খাদিম প্রশ্ন করে যে, আফগানিস্তানে যুদ্ধের পর পৃথিবীর উপর কি প্রভাব পড়বে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আফগানিস্তানের এই যুদ্ধ বিগত একশ বছর ধরে অব্যাহত। এভাবেই চলে আসছে, সেখানে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সমানে চলছে। সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ (রা.)-এর শাহাদতের পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, 'কাবুলের ভুমি! তুমি শান্তিতে থাকবে না'- নিরবধি সেই থেকে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নৈরাজ্যপূর্ণ। সেখানকার শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে আর এখন সেখানে অস্থিরতাই বিরাজ করছে। আর এখন তো তালিবানরাও এসে গেছে, দেখা যাক তারা কিভাবে শাসন করে আর কতদিন অন্যান্য দেশগুলি তাদের সঙ্গে চলতে পারে। বর্তমান যুগে কোনও দেশই আন্তর্জাতিক বলয়ের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে চলতে পারে না। এরা যদি ঠিকমত সরকার পরিচালনা করতে পারে তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে কিছু সময় পর্যন্ত টিকে থাকবে। কিন্তু তাদের যে উগ্রপন্থাপূর্ণ চিন্তাধারা,তা থেকে এটাই অনুমান করা যায় যে কিছু কাল পর সেখানে পুনরায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। আর এখন তারা যেভাবে আফগানিস্তানের পতাকা নামিয়ে নিজেদের তালিবানী পতাকা উত্তোলন করেছে (তাতেও অবাক হতে হয়)। কেননা তারা তো কোনও দেশ জয় করে নি। আফগানিস্তানের পতাকা তো থাকা উচিত ছিল। এ নিয়ে মানুষ নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, বিক্ষোভ মিছিলও বের করেছে এবং প্রতিবাদ হিসেবে আফগানিস্তানের পতাকা তুলেছে। এই তালিবানরা যদি নিজেদের নীতি পরিবর্তন করে শান্তি, সৌহার্দ্য ও স্বচ্ছতার নীতি অনুসরণ না করে, আর বিশ্ববাসী যদি অনুভব করে যে এরা বিশ্বের জন্য বিপদ, তবে পুনরায় সেখানে অন্য কোনও শক্তি এসে রাজত্ব করার চেষ্টা করবে।

এক খাদিম প্রশ্ন করে যে, কিছু কিছু বিজ্ঞানীদের দাবি, কোরোনা মহামারি মানুষের মনস্তত্বের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। হুযুর আনোয়ার এ সম্পর্কে কি অভিমত পোষণ করেন আর এর কারণে হুযুর আনোয়ারের জীবনে কি পরিবর্তন এসেছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার জীবনে কোনও পরিবর্তন আসে নি। বিজ্ঞানীদের এই দাবীর নেপথ্যে কারণগুলি হল যে সব বস্তুবাদী, জাগতিকতাকে ঘিরেই যাদের চিন্তাভাবনা, যারা ক্লাবে না গিয়ে থাকতে পারে না, এ সব বিষয়ের উপর যখন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হল তখন তারা অস্থির হয়ে উঠল। এমনিতেও যখন কোনও মহামারির প্রাদুর্ভাব হয় আর তা ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে আর সমগ্র পৃথিবীময় বিস্তৃত হয়ে পড়ে তখন মানুষের উপর এক প্রকার মনস্তাত্বিক প্রভাব পড়ে। তাদেরকে এই আশঙ্কা ঘিরে ধরে যে জানি না প্রাণ রক্ষা পাবে কি না। মানুষ যদি জানত যে জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ্‌র হাতে আর সতর্কতা হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা যে সব পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন তা গ্রহণ করা উচিত, যতটুকু চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে তা করা উচিত- তখন কিছু জিনিসের অভাব, কিছু কিছু জিনিস সক্রিয় না থাকার কারণে, গতানুগতিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে কিছুটা হলেও উৎকণ্ঠা তৈরী হয়। কিন্তু অত বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- 'আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব'-অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে মন প্রশান্তি লাভ করে। অতএব, এমন পরিস্থিতি বেশি করে আল্লাহ্ তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। কিন্তু বস্তুবাদীরা এদিকে প্রত্যাবর্তন করে না। এই কারণে তারা বেশি প্রভাবিত হয়।

আমার প্রাত্যাহিক রুটিনে কোনও তারতম্য ঘটে নি। আমি তো সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজের পর সময়ই পাই না। আমি তো বুঝতেই পারি না যে বাইরে মহামারি চলছে কি না। আর দেখাসাক্ষাতের যে অভাবটুকু ছিল তা তোমাদের সঙ্গে এই ভার্চুয়াল সাক্ষাতের মাধ্যমে পুরণ করে নিই। সমগ্র বিশ্বে জামাতের বিস্তৃতি, সেই সব কাজের তত্ত্বধান করতে করতে কিভাবে যে সময় কেটে যায় বোঝাই যায় না। সময় কম আর কাজ বেশি বলে মনে হয়।

এক খাদিম প্রশ্ন করে যে, বর্তমান যুগে কোরোনার কারণে যে সব সমস্যাবলী দেখা দিচ্ছে- পারিবারিক বিবাদের বিষয়টি- এর সমাধান কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই কোরোনা মহামারির সময় মানুষের উচিত খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করার। এই মহামারি যদি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শাস্তি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রেও নিজেদের মধ্যে ভালবাসা বজায় থাকা উচিত আর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। পরস্পরের মধ্যে শান্তি, সৌহার্দ্য এবং নির্বিবাদ সম্পর্কের পরিবেশ তৈরী করা উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লা এই মহামারিকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেন। আর এটা যদি কোনও পরীক্ষা হয়ে থাকে,তবে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে এই পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ করেন আর আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী হয়। তবে কিছু বিধিনিষেধের কারণে কিছু কিছু মনস্তাত্বিক প্রভাব হয়ে থাকে। কিন্তু এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা উচিত যে আল্লাহ্ তা'লা যেন এই ব্যাধি দূর করেন আর এই সব বিধিনিষেধ দূর হয় আর তিনি সকলের উপর কৃপা করেন। তাই দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং একথা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে আমাদেরকে একে অপরের অধিকার প্রদান করতে হবে। এই কাজ করলে তবেই প্রত্যেক পরিবারে শান্তির পরিবেশ তৈরী হবে। কোরোনা একটা ছুতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে স্বামী বা পিতারা সারাদিন বাইরে থাকত, তাদের মেজাজ ও প্রকৃত কিরূপ তা সহজে জানা যেত না। এখন যেহেতু তারা বাড়িতে থাকে তাই তাদের কঠোরতা স্ত্রী ও সন্তানদের সহ্য করতে হচ্ছে। তাই তোমরা বলছ আব্বা এমন করেছে বা মা খিটখিটে মেজাজের হয়ে গেছে। আগে তোমরাও বাইরে ঘুরতে, এখন কিছুটা কম বাইরে যাও। কিন্তু বাইরে ঘুরতে যাও সে কথা আমি জানি।তাই দোয়া কর যে আল্লাহ্ তা'লা যেন এই দ্রুত এই ব্যধি অপসরণ করেন।

সাক্ষাতের শেষে হুযুর আনোয়ার নিম্নরূপ নসীহত করেন।

যে ইজতেমা হচ্ছে তা তখনই উপকারে আসবে যখন এর প্রকৃত উদ্দেশ্যে কি সে নিয়ে আপনারা এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি। মানুষ যদি সেই উদ্দেশ্য সম্পকে অনবহিত থাকে তবে কোনও লাভ নেই। জীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেছেন যে, 'আমি মানুষকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' আর একজন আহমদী মুসলমানের একথা জানা উচিত যে, এটিই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাকে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

এর আনুগত্যে আমার লাভ হয়েছে। যদি আমি মহানবী (সা.)-এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর অনুসরণ না করতাম আর আমার পুণ্যকর্ম সারা পৃথিবীর পাহাড়সমও হতো, তবুও আমি কখনো তাঁর সাথে বাক্যালাপ এবং কথোপকথনের সম্মান লাভ করতাম না। কেননা, এখন একমাত্র মুহাম্মদী নবুয়ত ছাড়া সকল নবুয়ত বন্ধ এবং শরীয়তধারী নবী কেউ আসতে পারবে না। তবে শরীয়ত বিহীন নবী হতে পারে কিন্তু শর্ত হলো, প্রথমে উম্মতী হতে হবে।

তিনি আরো বলেন, আমি আমার সত্য এবং পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে জানি যে, কোন মানব সেই নবী (সা.)-কে অনুসরণ করা ছাড়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না আর পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান থেকেও অংশ পেতে পারে না। আর আমি এখানে এটিও বলতে চাই যে, সে জিনিসটি কী, যা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার এবং পূর্ণ অনুসরণের ফলে হৃদয়ে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়? স্মরণ রাখা উচিত, তা হলো, "কালবে সালিম" তথা সুস্থ হৃদয় অর্থাৎ হৃদয় থেকে বস্তু-জগতের ভালোবাসা উঠে যায় আর হৃদয় এক স্থায়ী ও অক্ষয় পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষী হয়ে যায়। এরপর হৃদয়ের স্বচ্ছতার কারণে খোদার এক স্বচ্ছ এবং কামেল ভালোবাসা লাভ হয় আর এসব কিছুমহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে উত্তরাধিকার সূত্রে হয়ে থাকে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন,অর্থাৎ তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমরা খোদাকে ভালোবেসে থাক তাহলে আস, আমার অনুসরণ কর, যেন খোদাও তোমাদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান: ৩২)মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা এবং আনুগত্য মানুষকে খোদার প্রিয়ভাজন করে। এই সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা কাউকে ভালোবাসার জন্য এই শর্ত নির্ধারণ করেছেন যে, তাকে মহানবী (সা.)- এর আনুগত্য করতে হবে। পাপ থেকে পরিত্রাণ ও আল্লাহর কাছে গৃহীত হবার জন্য পুণ্যকর্ম করাই তো যথেষ্ট হওয়া উচিত, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) অনুসরণের প্রয়োজন কী?- এক ব্যক্তির এ মর্মে আপত্তির খণ্ডনে তাঁর (আ.) উত্তর হলো, সৎকর্মের সৌভাগ্য লাভ করাও আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত সামর্থ্যের ওপরই নির্ভর করে। অতএব খোদা তা'লা যেহেতুএক ব্যক্তিকে স্বীয় যুক্তিযুক্ততার ভিত্তিতে ইমাম এবং রসূল মনোনীত করেছেন এবং তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন, তাই যে ব্যক্তি এই নির্দেশ আসার পরও তাঁর অনুসরণ করে না, তাকে পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য দান করা হয় না। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তির অনুসরণ আবশ্যক। শুধুনিজের কর্ম যথেষ্ট নয়। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য।" তিনি (আ.) বলেন, "আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আন্তরিকভাবে অনুসরণ এবং তাঁকে ভালোবাসা অবশেষে মানুষকে খোদার প্রিয়ভাজন করে। এমনভাবে সে খোদার প্রিয়ভাজন হয় যে, তিনি তার হৃদয়ে খোদার ভালোবাসার এক দহন সৃষ্টি করেন। এমন ব্যক্তি তখন সবকিছুর প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে যায় আর তাঁর ভালোবাসা এবং আগ্রহ শুধুখোদার জন্য থাকে যায়। তখন তার ওপর ঐশী প্রেমের এক বিশেষ বিকাশ ঘটে আর প্রেম ও ভালোবাসার পূর্ণ রঙে তাকে রঙিন করে শক্তিশালী আকর্ষণে নিজের দিকে টেনে নেয়, তখন প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ওপর সে জয়যুক্ত হয় আর তার সাহায্য এবং সমর্থনে সকল অর্থে আল্লাহ্ তা'লার অলৌকিক বিষয়াদি নিদর্শনরূপে প্রকাশ পায়।"তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নবী বানিয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে খাতামধারী বানিয়েছেন, তাঁকে আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি বা আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব বিতরণের জন্য আল্লাহ্ তা'লা মোহর দিয়েছেন, যা অন্য কোন নবীকে আদৌ দেয়া হয় নি। এ কারণেই তিনি খাতামান্নাবিঈন বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর অনুসরণ নবুয়তের শ্রেষ্ঠত্বে ধন্য করে থাকে, তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নবী সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রাখে আর এই পবিত্রকরণ শক্তি অন্য কোন নবী লাভ করে নি। "উলামায়ে উম্মাতী কা আম্বিয়ায়ে বনী ইসরাঈল" হাদীসের এটিই প্রকৃত অর্থ। অর্থাৎ আমার উম্মতের আলেমগণ ইসরাঈলী নবীদের মতো হবে। আর বনী ইসরাঈলীদের মাঝে যদিও অনেক নবী এসেছেন কিন্তু তাদের নবুয়ত মুসার আনুগত্যের ফলে লাভ হয় নি বরং সেসব নবুয়ত সরাসরি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দানস্বরূপ ছিল। হযরত মুসা (আ.)-এর অনুসরণের তাতে বিন্দুমাত্র ভূমিকা নেই।

অতএব, এখন আমি আলেমদেরকে বলব যে, হে নামধারী আলেমগণ! ভাব আর চিন্তা কর, মহানবী (সা.)-এর সত্তাকে নবী সৃষ্টিকারী আখ্যা দিলে তাঁর মর্যাদা কি কমে না বাড়ে? কিন্তু তোমরা এই কথা নিয়ে আদৌ ভাববে না, কেননা তোমাদের জাগতিক স্বার্থ এর ফলে প্রভাবিত হয়। কিন্তু আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর সুউচ্চ মাকাম এবং মর্যাদার অন্তর্দৃষ্টি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই দান করেছেন। অতএব, প্রত্যেক আহমদী যেন মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণকে আবশ্যক করে নেয়, যেন সেই সমস্ত বরকত ও কল্যাণরাজি থেকে আমরা কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি যা তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক রাখার ওপর নির্ভর করে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর (সা.) পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ প্রেরণের গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতা দেখুন! সকল প্রকার নোংরা আন্দোলনের তিনি মোকাবিলা করেছেন, বিভিন্ন প্রকার সমস্যা এবং কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করেন নি। এই নিষ্ঠা এবং পবিত্রতার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। তাই আল্লাহ তা'লা বলেন, 'আল্লাহ্ এবং তাঁর সকল ফেরেশতা রসূলের প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন, হে বিশ্বাসীগণ তোমরাও সেই নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। (৩৩:৫৭)তিনি (আ.) বলেন, "এ আয়াত থেকে প্রতিভাত হয় যে, মহানবী (সা.)-এর পুণ্যকর্ম এমন ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা সেগুলোর প্রশংসা করার জন্য বা এর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেন নি, কোন শব্দের মাঝে সীমাবদ্ধ করেন নি। শব্দ তো পাওয়া সম্ভব ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজে তা ব্যবহার করেন নি অর্থাৎ তাঁর পুণ্যকর্মের প্রশংসাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, আল্লাহ্ তা'লা এর কোন সীমারেখা নির্ধারণ করতে চান নি। এমন আয়াত অন্য কোন নবী সম্পর্কে ব্যবহার করেন নি। তিনি বলেন, তাঁর (সা.) পবিত্র আত্মায় সেই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা ছিল, তাঁর কর্ম খোদার কাছে এত পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা এই চিরস্থায়ী নির্দেশ দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে মানুষ কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশে যেন দরূদ পাঠ করে।"

দরূদ কী উদ্দেশ্যে পড়া উচিত এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, দরূদ শরীফ এ উদ্দেশ্যে পড়া উচিত, যেন খোদা তা'লা তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণরাজি, তাঁর নবী (সা.)-এর প্রতি বর্ষণ করেন আর সারা বিশ্বের জন্য তাঁকে কল্যাণরাজির উৎসস্থলে পরিণত করেন, তাঁর মহিমা ও মাহাত্ম্য যেন ইহকালেও প্রকাশ করেন আর পরকালেও। এই দোয়া আন্তরিক আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের সাথে করা উচিত। যেভাবে কোন ব্যক্তি সমস্যার সময় পূর্ণ বিগলিতচিত্তে দোয়া করে, অনুরূপ মনোযোগ সহকারে দরূদ পড়া উচিত বরং আরো বেশি আকুতি-মিনতির সাথে বিগলিতচিত্তে দোয়া করা উচিত। কোন ব্যক্তিস্বার্থ থাকা উচিত নয় যে, এর ফলে আমার এই পুণ্য লাভ হবে বা এই পদমর্যাদা লাভ হবে, বরং একমাত্র উদ্দেশ্য এটিই হওয়া উচিত যে, ঐশী কল্যাণরাজি মুহাম্মদ (সা.)

এর ওপর বর্ষিত হোক আর তাঁর প্রতাপ ইহ ও পরকালে দেদীপ্যমান হোক। অধিকন্তু এ লক্ষ্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া উচিত। দিবারাত্র স্থায়ীভাবে এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা উচিত, এমনকি হৃদয়ে এর চেয়ে বড় কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়।পুনরায় তিনি আমাদেরকে নসীহত করেন যে, অজস্র ধারায় দরূদ শরীফ পাঠ কর, কিন্তু প্রথাগত বা অভ্যাসগতভাবে নয়, বরং মহানবী (সা.)-এর সৌন্দর্য ও অনুগ্রহরাজি স্মরণ করে তাঁর পদমর্যাদার উন্নতির জন্য এবং তাঁর সাফল্যের জন্য দরূদ পড়। তাঁর সাফল্য কী? তা হলো, সারা পৃথিবীতে ইসলামের বিস্তার লাভ করা এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়া। বর্তমানে ইসলামের নামে যে দুষ্কৃতি এবং নৈরাজ্য ছড়িয়ে রয়েছে, তার অবসান ঘটানো। অতএব আজ প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক হলো, এমন অবস্থা নিজের জীবনে আনয়ন করা, এভাবে দোয়া করা আর দরূদ পড়া। আমাদের জন্য একমাত্র রাস্তা হলো দোয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর দুষ্কৃতির অবসান ঘটানো।

পুনরায় একবার তাঁর এক শিষ্যকে দরূদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আপনি দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। যেভাবে কোন ব্যক্তি তার প্রিয়জনের জন্য বাস্তব কল্যাণ কামনা করে, একই উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আন্তরিকতার সাথে মহানবী (সা.)-এর জন্য কল্যাণের দোয়া করুন, আর যারপরনাই আকুতি-মিনতির সাথে সেই দোয়া করুন। সেই আকুতি এবং দোয়ায় যেন কোনপ্রকার কৃত্রিমতা না থাকে বরং মহানবী (সা.)-এর সাথে সত্যিকার ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় আর হৃদয়ের সত্যিকার নিষ্ঠার সাথে সেই সমস্ত আশিস মহানবী (সা.)-এর জন্য কামনা করা উচিত যা দরূদ শরীফে উল্লিখিত আছে। ব্যক্তিগত

ভালোবাসার লক্ষণ হলো- দরূদ পড়তে গিয়ে মানুষের কখনো ক্লান্ত-শ্রান্ত বা বিরক্ত না হওয়া বা কোন ব্যক্তিস্বার্থ না থাকা, বরং শুধুই এ উদ্দেশ্যে পড়া যেন মহানবী (সা.)-এর প্রতি খোদার আশিস এবং কল্যাণরাজি প্রকাশিত হয়।

দরূদ শরীফ পাঠের প্রজ্ঞার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, যদিও মহানবী (সা.)-এর অন্য কারো দোয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু এতে একটি গভীর রহস্য অন্তর্নিহিত রয়েছে, আর তা হলো- যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত ভালোবাসার ভিত্তিতে কারো জন্য রহমত এবং বরকত কামনা করে, সে ব্যক্তিগত ভালোবাসার সম্পর্কের কারণে সেই ব্যক্তির সত্তার একটা অংশ হয়ে যায়। আর যেহেত মহানবী (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'লার অশেষ কল্যাণরাজি রয়েছে তাই দরূদ প্রেরণকারীদের যারা ব্যক্তিগত ভালোবাসার ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-এর জন্য আশিস যাচনা করে, তারা অশেষ বরকত থেকে নিজেদের আন্তরিকতা অনুসারে অংশ পায়, কিন্তু আধ্যাত্মিক আবেগ ও উচ্ছ্বাস এবং ব্যক্তিগত ভালোবাসা ছাড়া সেই কল্যাণরাজি খুব কমই প্রকাশ পায়। অতএব একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ, উচ্ছ্বাস এবং আন্তরিকতার সাথে দরূদ পাঠ করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা দরূদ পাঠের প্রতি আমাদের মাঝে এই উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন আর আমরা যেন প্রকৃত অর্থে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণকারী হই আর সেসব সাফল্য এবং বিজয় যেন দেখি এবং তার যেন অংশ পাই- যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা প্রদান করেছেন আর যা তাঁর (সা.) নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকের মাধ্যমে এ যুগে অবধারিত করা হয়েছে। আমরা মুসলমান কি মুসলমান নই- এর জন্য কোন নামধারী আলেমের সনদ বা সার্টিফিকেটের আমাদের প্রয়োজন নেই অথবা কোন ফরমে লিখার কারণে আমরা মুসলিম বা অমুসলিম হয়ে যাই না। আমাদের শুধুএকটি সনদের প্রয়োজন আর সেই সনদ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি এই সনদ আমাদেরকে তখন দান করবেন বা এই সনদে আমাদের তখন ধন্য করবেন যখন আমরা সত্যিকার অর্থে হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মত হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালনকারী হব, তাঁর অনুসরণকারী হব। আমাদের দরূদ মহানবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে এরপর আমাদেরও সেই সমস্ত বরকতের উত্তরাধিকারী করবে যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

একইভাবে এবছরটিও সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। কোন কোন দেশে চব্বিশ ঘন্টা বাকি আছে, কোন কোনটিতে দুই দিন এবং দুই রাত বাকি আছে। এই অবশিষ্ট সময়টুকুদরূদ শরীফে ভরে দিন আর দরূদ এবং সালামের মাধ্যমে নববর্ষকে শুভেচ্ছা জানান, যেন আমরা অচিরেই সেই সমস্ত কল্যাণরাজি অর্জন করতে পারি যা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। সকল বিরোধীর অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং তাদের অনিষ্ট তাদেরই মুখে ছুঁড়ে মারুন।

আমরা এখন দোয়া করব, দোয়ায় আমার সাথে যোগ দিন। (দোয়া) এখন (একটুথামুন) আমি জলসা সালানা কাদিয়ানের উপস্থিতি আঠারো বা উনিশ হাজার বলেছিলাম, প্রকৃত সংখ্যা যা দেখা যাচ্ছে তা হলো আঠারো হাজার আট শত চৌষট্টি জন। এ মুহূর্তে সেখানে আটচল্লিশটি দেশের প্রতিনিধি রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এ জলসার কল্যাণ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হবার সৌভাগ্য দিন। সেখানে আগত অতিথি যারা বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন, পাকিস্তান থেকেও এসেছেন, তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে স্ব স্ব দেশে ফিরিয়ে নিন এবং স্বীয় নিরাপত্তার চাদরে স্থান দিন। এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের উপস্থিতি এ মুহূর্তে পাঁচ হাজার তিন শত পঁয়ষট্টি জন, মহিলাদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার চার'শ আর পুরুষ দুই হাজার ছয়'শ। এখন কাদিয়ান থেকে যে পরবর্তী প্রোগ্রাম উপস্থাপন করার কথা তা আরম্ভ করুন।

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)**

৮ পাতার পর......

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যদি আমরা সেই ব্যক্তির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করি, তাহলে নিজেদের রক্ষা করতে পারবো, অন্যথায় নয়।" আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশৃঙ্খলা নিয়ে আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:"মুসলমানরা অন্যদের ওপর নির্ভর করছে এবং একে অপরকে হত্যা করছে যদিও আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন আরেকজন মুসলমানকে হত্যা করা মারাত্মক পাপ। উপরন্তু অন্যান্য মুসলমানদের হত্যার জন্য তারা অমুসলমানদের সাহায্য নিচ্ছে। সুতরাং অমুসলমানরা যখন আপনার সাহায্যে আসবে তখন তারা আপনাকে তাদের শর্তাবলী মানতে বাধ্য করবে। তাদের শর্তাবলীর মাধ্যমে তারা আপনার সম্পদের একাংশ হস্তগত করবে। যখন এই দেশগুলো সম্পদ হস্তগত করে তখন তারা কোন ছোট অংশ নেয় না। উপরন্তু মুসলিম দেশের নেতৃত্ব যেহেতু সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় সেহেতু অবশিষ্ট সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখে, আর এতে দরিদ্র জনগণ দুর্বল হতে দুর্বলতর হতে থাকে। অপরদিকে এই [অমুসলিম] শক্তিগুলো সুযোগ লাভ করে এবং বলে, যেহেতু তোমার দেশের সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যে নিপতিত, তাই আমরা তোমাদের সহায়তা করব। এভাবে তারা পুনরায় হস্তক্ষেপের সুযোগ লাভ করে। সুতরাং এটি একটি দুষ্ট চক্র যা চলে আসছে এবং ততদিন চলতে থাকবে, যতদিন পর্যন্ত না মুসলমানরা বুঝতে পারে যে তাদেরকে নিজেদের দুই পায়ে ভর করে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে এবং নিজেদের মস্তিষ্ক ও সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে হবে যেন তারা তাদের সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে পারে।"

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, এখানে যদি কারো মনে কোন প্রকারের আশঙ্কা বা রক্ষণশীলতা থেকে থাকে- মসজিদ তৈরী হয়ে গেলে কী ঘটবে- যেমনটি তিনি বলেছেন, এখানে বিরোধিতা হয়েছে, কিন্তু খুব কম মানুষের পক্ষ থেকে। কিন্তু আমি এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, বিবাদ বিপত্তি তৈরী হওয়া নিয়ে যদি কোনও মনের মধ্যে আশঙ্কা ছিল, কোনও উৎকণ্ঠা ছিল,তবে এই মসজিদ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত আশঙ্ক দূর হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ্॥ আর আগের থেকে বেশি আহমদীরা এখানে সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকবে। আর আপনাদের যাবতীয় আশঙ্কা ও উদ্বেগকে দূর করবে। আমাদের উদ্দেশ্য হল, যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা। কেবল কষ্টের আশঙ্কা দূর করা নয়, যেমনটি সম্মানীয় বক্তা উল্লেখ করেছেন,আশঙ্কা ছিল যাতে কোনও প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। আমরা শুধু অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কাই দূর করব না বরং যাবতীয় অসুবিধাকেই দূর করব। সকল ক্ষেত্রে ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের সেবা ও সহায়তার কাজে এগিয়ে আসব। অতএব, এই দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রত্যেক নাগরিকের এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এই মসজিদটি শান্তি ও ভালবাসার নতুন পথ উন্মোচিত করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সচরাচর বলা হয় যে, মানুষের কাজকর্ম থেকে জানা যায় যে সেটি সঠিক কি না। কিন্তু আমাদের রসুল করীম (সা.) আমাদেরকে আদেশ করেছেন যা প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। কর্মের ফলাফল নির্ভর করে সদিচ্ছা বা সংকল্পের উপর। অনেক সময় মানুষ লোকদেখানো কাজ করে থাকে। কিন্তু সেই কাজের পিছনে তার উদ্দেশ্য সৎ থাকে না। তাই আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তোমাদের প্রত্যেকটি কর্মের পিছনে সদুদ্দেশ্য থাকা উচিত। কোনও কাজ যেন কেবল লোকদেখানোর জন্য না হয়। বরং সৎ উদ্দেশ্যে হয়। আর প্রধান উদ্দেশ্য হল খোদা তা'লা সন্তুষ্ট করা। সেই খোদাকে সন্তুষ্ট করা যিনি সকলের খোদা, যিনি সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং সৃষ্টিজগতকে তিনি ভালবাসেন। অতএব, এই বিষয়টি সব সময় স্মরণ রাখবেন আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখনও এবং মসজিদ নির্মাণ হওয়ার পরও এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর পক্ষ থেকে এবিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, আমাদের উদ্দেশ্য সৎ, এর পেছনে কোনও লোকদেখানো বিষয় নেই, অন্য কোনও উদ্দেশ্য অর্জন এর লক্ষ্য নয়। এর পিছনে এতটুকু বিষয়ও নেই যে, কোনও মতে মসজিদটি তৈরী হয়ে যাক, এর পর আমরা নিজেদের খেয়ালখুশি মত কাজ করব। বরং মসজিদ নির্মাণের পর ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের পথ আরও প্রশস্ত হবে। ইনশাআল্লাহ।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 11 Aug, 2022 Issue No. 32

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া সিঙ্গাপুরের সদস্যদের সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত

গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২১, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) সিঙ্গাপুরের সদস্যদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ১৯ জন খোদ্দাম সদস্য সিঙ্গাপুরের ত্বাহা মসজিদে সমবেত হন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হওয়া একটি আনুষ্ঠানিক অধিবেশনের পর উপস্থিত সদস্যবৃন্দ হুযূর আকদাসকে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন কীভাবে অন্যের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা থেকে হৃদয়কে মুক্ত করা যায় সে বিষয়ে হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞাসা করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

বলেন: "আমরা সেই নবীর অনুসারী যিনি শেষ নবী [মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)] এবং যার অন্তর এ ধরনের সকল প্রকার মন্দ ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত ছিল। অধিকন্তু, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ), যিনি এ যুগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মতী নবী হিসেবে আগমন করেছেন, তিনি বলেছেন, 'আমি এই যুগে মানবজাতিকে তাদের স্রষ্টার নৈকট্য অর্জনের জন্য এবং দ্বিতীয়ত, তাদের সঙ্গী-সাথীদের প্রতি তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য উপলব্ধি করানোর জন্য আগমন করেছি।' তিনি বলেন যে, আমরা এ দায়িত্ব পালন করতে পারি না যদি না আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ হয় এবং আমাদের হৃদয় সকল প্রকার শত্রুতা, বিদ্বেষ বা হিংসা-ঈর্ষা হতে মুক্ত থাকে। যদি এরূপ হয় তবেই আমরা একে অপরের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবো। আমরা নিজেরাই এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারি না, এজন্য আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য চাইতে হবে। নিজেদের প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ যেন আপনাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে দেন এবং যে কোন ব্যক্তির প্রতি আপনাদের অন্তরের সমস্ত বিদ্বেষ দূর করে দেন। অন্য একজন খাদেম উল্লেখ করেন যে, সিঙ্গাপুরের বৃহত্তর মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধিতায় একটি ফতোয়া (ধর্মীয় অধ্যাদেশ) আজও বলবৎ রয়েছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনি আপনার বন্ধুদেরকে বলবেন যে, আমরা প্রকৃত মুসলমান; কারণ, আমরা এক এবং সর্বশক্তিমান প্রভুকে বিশ্বাস করি এবং আমরা মহানবী (সা.) এর নবুওয়্যতের চূড়ান্ততায় (খাতামান্নাবীঈন) বিশ্বাস করি। আমরা খাতামান্নাবীঈন-এ বিশ্বাস করি; কিন্তু আমাদের সংজ্ঞা ভিন্ন। (আমরা বিশ্বাস করি যে,) মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শেষ যুগে একজন ব্যক্তির আগমন করার কথা ছিল এবং (আমরা বিশ্বাস করি যে,) সেই ব্যক্তি কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর সত্তায় আগমন করেছেন, তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ভবিষ্যদ্বাণীকৃত 'মাহদী'। তিনি মহানবী (সা.)-এর একজন অধস্তন নবী এবং তাঁর (সা.)-এর অনুসারীদের মধ্য থেকে এক জন 'উম্মতি নবী'। মহানবী (সা.)-এর দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, তিনি আসবেন (তাঁর আগমন হবে)। পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে যে, শেষ যুগে একজন নবী আসবেন। সুতরাং, আমরা বিশ্বাস করি যে, সেই ব্যক্তি এসে গেছেন এবং তাঁর মর্যাদা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর এবং মহানবী (সা.) তাঁর একটি হাদীসে চারবার তাঁকে 'নবী' বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং, এটি মহানবী (সা.)-এর খাতামিয়্যতের মোহর ভঙ্গ করে না। কারণ, তিনি ইসলামের মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত নবী ও প্রকৃত অনুসারী।"

হুযূর আকদাস (আই.) আরও ব্যাখ্যা করেন যে, যারা আহমদী মুসলমানদেরকে অমুসলিম বলে ঘোষণা করে, তারা নিজেরাও ঈসা (আ.)-এর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছে। সেজন্য তারাও বলতে পারে না যে, পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবেন না। আর তাদের এই নিজস্ব বিশ্বাস তাদের, 'খাতামান্নাবীঈন' বিষও।ধর্মের প্রচারে তাদের প্রয়াসকে আরও জোরদার করার বিষয়ে উৎসাহিত করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন:"তবলীগের মাধ্যমে আপনারা এই বার্তাটি ছড়িয়ে দেবেন এবং মানুষের মন থেকে সন্দেহ দূর করবেন এবং আপনারা তাদের কাছে (আপনার দৃষ্টিভঙ্গি) ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন। সুতরাং, এটি পুরোটাই নির্ভর করে আপনার তবলীগের স্তরের (অবস্থার) ওপর এবং আপনি তবলীগে কতটা দক্ষ, নিজস্ব মতামত প্রকাশে আপনি কতটা সাহসী, তার ওপর। ফতোয়া সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তারা সবসময়ই বিদ্যমান। অআহমদীরা সবসময়ই আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে।

মূলকথা হল, আমরা যেন প্রকৃত মুসলমানদের মতো আচরণ করি এবং এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করি। আমাদের প্রতিটি কাজ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হওয়া উচিত এবং লোকেরা যখন দেখবে যে, আমরা একজন মুসলমানের মতই আচরণ করছি তখন তারা নিজেরাই অবগত হবে যে, এই ফতোয়াগুলো অযৌক্তিক (ভুল)।

১ম পাতার শেষাংশ.....

হয়েছে যা এই কিতাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে। কোনও শিক্ষক যদি তার ছাত্রকে বলে, সমস্ত বই নিয়ে এস, তবে একথার অথ এই নয় যে লাইব্রেরির সমস্ত বই তুলে নিয়ে আসবে। বরং এর অর্থ হবে নিজের বইগুলি নিয়ে এস। অনুরূপভাবে এখানে 'কুল্লু' বলতে সেই সব বিষয় যা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আবশ্যক। কেউ যদি বলে যে অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা শুধু হাদীসেই পাওয়া যায়। তবে এর উত্তর হল সমস্ত নীতি কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে যে সব ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে তা কুরআন করীমেরই ব্যাখ্যা। মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে আল্লাহ্ তা'লা সব থেকে বেশি কুরআন করীমের বোধগম্যতা দান করেছিলেন। তিনি কুরআন করীম থেকে যে সব অর্থ গ্রহণ করতেন তা আমরা করতে পারি না। তাই তিনি যদি কুরআন অর্থের কিছু ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন তবে এর অর্থ এই নয় যে, কুরআন করীম অসম্পূর্ণ। বরং এর অর্থ হল রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর নিজের পরিপূর্ণ বোধগম্যতা দ্বারা কুরআন করীম থেকে সেই বিষয়গুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। যদিও আমাদের মস্তিষ্ক এই জটিলতাকে উপলব্ধি করতে পারে নি।

আহলে কুরআন সম্প্রদায় এই বিষয়টি নিয়ে ভীষণ রকমের বিভ্রান্তির শিকার। তাদের দাবি, মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের মতই মানুষ ছিলেন,তাঁর কথা কেন মানব? সেই কথা মানব যা কুরআনে আছে। অথচ রসুল করীম (সা.)-এর কথা মান্য করার প্রশ্নই অবান্তর। বরং প্রশ্ন হল তিনি (সা.) কুরআন করীমকে আমাদের থেকে বেশি বুঝতেন।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَمَا يَنۡطِقُ عَنِ الۡهَوٰى اِنۡ هُوَ اِلَّا وَحۡیٌ يُّوۡحٰى

রসুলুল্লাহ্ (সা.) কুরআন করীম সম্পর্কে যা কিছু বলতেন তা ঐশী ওহী অনুসারেই বলতেন, কোনও ভুল করতেন না। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যাকে সুরক্ষিত রেখেছেন, কুরআন সম্পর্কে তার বোধগম্যতাকে অন্যদের বোধগম্যতার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। অমুক হাদীস সঠিক নয় বলে বিতর্ক করার অধিকার আমাদের রয়েছে, কিন্তু একথা বলতে পারি না যে, হাদীস ঠিক আছে, কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.) ভুল করেছেন। নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক। কুরআন করীমের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা যদি আমরা বুঝতে না পারি তবুও তাঁর ব্যাখ্যাকেই আমাদের সঠিক বল বিশ্বাস করতে হবে। তবে শর্ত হল, যে হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে সেই হাদীসটি যেন হাদীসের যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়।

এখানে কুরআন করীমের চারটি কাজের কথা বলা হয়েছে। ' تِبۡیَانًا لِّکُلِّ شَیۡءٍ অর্থাৎ আবশ্যকীয় আধ্যাত্মিক বিষয়াদির ব্যাখ্যা এতে বিদ্যমান। ২) হিদায়াত। ৩) রহমত ৪) মোমেনদের জন্য সুসংবাদ।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১৮)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir